নরেন্দ্রনাথ মিত্র

আরতি প্রকাশনী
১ কলেজ রো, কলকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ

ফাল্গুন, ১৩৬৭

ফেব্রুয়ারি, ১৯৬১

প্রকাশক

বীরেন নাগ

১ কলেজ রো

কলকাতা-৯

মুদ্রক

দিবাস্পতি দত্ত

সাক্কর মুদ্রণী

১ কলেজ রো,

কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ-শিল্পী

অরুণ বণিক

দুই টাকা

॥ স্বরসন্ধি ॥

॥ স্বরসন্ধি ॥ রেখা ॥ উপনয়ন ॥ সেই মুখ ॥

॥ দূত ॥ স্তূপ ॥ গ্রন্থি ॥ যযাতি ॥ ক্যামেরা ॥

ফোনটা বেজে চলেছে। বাজুক। অঞ্জনা না ধরা পর্যন্ত ও ফোন বেজেই চলবে। নিতান্তই যদি না ধরে দুএক মিনিট যেতে দেয় তা হলে অবশ্য ফোনটা থামবে। আজ রাত্রে আর বাজবে না। কিন্তু মিনিট দুই কি মিনিটখানেক ধরে ফোনটাকে বাজতে দেওয়া বোধ হয় ঠিক হবে না। পাশের ঘরে দাই সুভদ্রা ঘুমোচ্ছে। ওর হয়তো ঘুম ভেঙে যাবে। নিচে চাকর দারোয়ান আছে। তারা ব্যস্ত হয়ে উঠে আসবে। ভাববে ঘুমন্ত লেডী ডাক্তারকে কোন পেশেণ্ট বুঝি ডেকে চলেছে। তা কথাটা মিথ্যা নয়, যে ডাকছে সেও এক পেশেণ্ট বই কি।

অঞ্জনা হাতের বইখানা উপুড় করে বিছানার ওপর নামিয়ে রেখে রিসিভারটা তুলে ধরল, 'হ্যালো।'

ওপার থেকে প্রশ্ন এল, 'তুমি কি ঘরে ছিলে না?'

'ছিলাম বই কি। ঘর ছেড়ে আর কোথায় যাব।'

'ছিলেই যদি, সঙ্গে সঙ্গে ধরলে না কেন। তুমি কি তোমার রুগীদের বেলায়ও এইরকম কর? সহজে ফোন ধর না?'

অঞ্জনা একটু হাসল, 'সব রোগী তো আর সমান নয়। ক্রনিক রোগী আছে, বিনা ভিজিটের রোগী আছে—'

'আমি বুঝি তোমার বিনা ভিজিটের রোগী?'

গলার স্বরে অমনি আহত অভিমান ফুটে উঠেছে। অঞ্জনা একটু চুপ করে রইল।

'মানে তুমি চাও না, আমি এই যোগাযোগটুকু রাখি। তোমাকে আর বিরক্ত করি।'

অঞ্জনা একটু হাসল। মাঝে মাঝে নির্মম প্রবঞ্চক পুরুষও মাখনের মত কী মোলায়েমই না হয়!

'তা যদি বুঝতেই পেরে থাকো তাহলে—।'

'বুঝতে খুবই পারি। তবু দিনের শেষে তোমাকে একবার করে না ডেকে পারি নে। মনে না করে পারি নে।'

অঞ্জনা হেসে উঠল, 'অক্ষম হবার জন্যে কী অপূর্ব ক্ষমতাই না তুমি আয়ত্ত করেছ।'

'তা ঠিক। কিছু কিছু অক্ষমতা আমার আছে। তা কার না থাকে অঞ্জনা? কিন্তু আমি চাইনে তুমি আমার দুষ্কৃতির এক স্থায়ী স্মৃতিস্তম্ভ হয়ে থাকো।'

অঞ্জনা হাসল, 'ও সেই কথা? এমন মনুমেণ্টের তোমার অভাব আছে নাকি? কটা সরাবে? কটা ভাঙবে?'

এ প্রশ্নের জবাব এল না। কিন্তু আগের কথার জেরই চলতে লাগল, 'আমি চাইনে অঞ্জনা তুমি সেই স্মৃতি মনের মধ্যে এমন করে পুষে রাখ। সেই স্মৃতি তো আর এখন শতদল নয়, শত কণ্টক। আমি যেখানে সংসারের মধ্যে থেকে সব সুখ, সব স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে চলেছি—।'

অঞ্জনা বাধা দিয়ে হেসে বলল, 'আমি সেখানে একপ্রান্তে বসে একাদশী করছি সেই দুঃখ তোমার আর সহ্য হচ্ছে না, এই তো?'

'অঞ্জনা, তোমার কাছে এই উপহাস, এই লাঞ্ছনা আমার প্রাপ্য। কিন্তু সত্যিই সহ্য হয় না। বিশ্বাস করো। আমি বলি, তুমি এবার বিয়ে করো। তোমারও তো বয়স ত্রিশ হতে চলল অঞ্জনা। তুমি ডাক্তার। সবই তো বোঝ। আমি চাই তুমি এবার স্বামী সন্তান সংসার নিয়ে—।'

অঞ্জনা বলল, 'রাত দুপুরে তোমার সেই পুরোন ঘটকালি এখন রাখো। এবার বাড়ি যাও। তোমার স্ত্রী জেগে বসে আছেন। ফোনটা রেখে দিলাম।'

অঞ্জনা রিসিভারটা নামিয়ে রাখল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। আহা, বিদায়ের সময় দুটি একটি ভালো কথা বললে হত। মন থেকে না আসুক মুখে মুখে বানিয়ে বললেও তো পারত অঞ্জনা। সারাদিন খাটুনির পর এখন বাড়ি ফিরছে সুধাংশু। একটু খুসি মনে ফিরতে পারত। কিন্তু পরমুহূর্তে নিজেরই হাসি পেল অঞ্জনার। আশ্চর্য তার মন, আর আশ্চর্য তার দুর্বলতা। এত মেয়ের এত রকমের রোগ সারাল অঞ্জনা, কিন্তু নিজের মনের রোগটাই সারাতে পারল না। সুধাংশুকে সে রোগী বহুদিন বলছিল, কিন্তু নিজেই বা অঞ্জনা কম রোগী কিসের।

হাতের ইংরেজী গোয়েন্দা কাহিনীটা রেখে দিল অঞ্জনা। আর ভালো লাগছে না। ঘুমের আগে ওষুধ হিসাবে সে এখন এইসব বইয়ের পাতা উলটায়। তাছাড়া আর কোনো আকর্ষণ নেই।

বই বন্ধ করল। ঘরের আলো নিবিয়ে দিল, কিন্তু শুতে আর গেল না অঞ্জনা। চেয়ারটা টেনে নিয়ে জানলার ধারে বসল। বাইরে শরতের ফুটফুটে জ্যোৎস্না। শহরতলী নিস্তব্ধ। আশেপাশের বাড়িগুলি ঘুমোচ্ছে। একটু দূরে তার নার্সিং হোমের রোগীদেরও রোগযন্ত্রণা বোধহয় আজ কম। সবাই ঘুমোচ্ছে। শুধু অঞ্জনার চোখেই আজ ঘুম নেই।

আশ্চর্য, সুধাংশুর ওপর তার দুর্বলতা এখনো গেল না। দুর্বলতা ছাড়া কি। এখনো তাকে একটু শ্লেষ করলে, কি কড়া কথা বললে, কি বিদায়ের সময় গুডনাইট না বলতে পারলে অঞ্জনার মন খারাপ হয়। ঘুমের ব্যাঘাত হয় রাত্রে। এখনো সুধাংশুকে সে প্রাণপণে আঘাত দিতে পারে না। সব যোগাযোগ বন্ধ করে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারে না তার সঙ্গে। না থাকতে পারাটা যে তার নারীত্বের অপমান একথা কি অঞ্জনা জানে না? খুবই জানে। তবু তো পারে না অঞ্জনা। আশ্চর্য তার মন। যে

মনে এত বিদ্রোহ, এত তেজ, এত জেদ, সেই মনই কাতর, দুর্বল। সেই মনেরই ক্লান্তি আর নিঃসঙ্গতার শেষ নেই।

অঞ্জনার মন আশ্চর্য বই কি। নইলে চৌদ্দ বছরের মেয়ে হয়ে বয়সে তার চেয়ে দ্বিগুণ বড় একটি সাধারণ পুরুষকে সে ভালোবাসবে কেন। সাধারণ ছাড়া কি। টালিগঞ্জের সেই সরু গলির মোড়ে মুখার্জি ড্রাগসকে তখন কটা লোকেই বা চিনত। কেই বা জানে তার মালিক সুধাংশু মুখুয্যেকে। নিজেকে ডাক্তার বলে পরিচয় দিলেও সুধাংশু যে দু তিন বছরের বেশি ডাক্তারি পড়েনি, এবং পড়েনি বলে প্রাকটিসও করে না, শুধু অন্যের প্রেসক্রিপসন অনুযায়ী ওষুধ বিক্রি করে অঞ্জনা তা সেই সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ার সময়েই জেনেছিল। তবু তো তার মন বিরূপ হয়নি। একজন সাধারণ কেমিষ্ট বলে তাকে অবজ্ঞা করে তবু তো অঞ্জনা সেদিন সরে আসতে পারেনি।

সেদিন কী দেখে মুগ্ধ হয়েছিল আজকের এই বুদ্ধিমতী লেডী ডাক্তার অঞ্জনা সেন? আজ ভাবতেও হাসি পায়। স্কুলের যাতায়াতের পথে মোড়ের একতলা সেই সরু ঘরখানা দেখে মুগ্ধ হয়েছিল। সামনেই একটা নারকেল গাছ বাঁকা হয়ে হেলে পড়ে ওষুধের দোকান আর দোকানের মালিকের আধখানা ঢেকে রেখেছিল। সেই সবুজ গাছের আড়ালে নীলচে রঙের সাইনবোর্ডখানা দেখে মুগ্ধ হয়েছিল অঞ্জনা। দেখে ভালো লেগেছিল কাঁচের চ্যাপটা শো-কেস আর লম্বা আলমারিটা। মনোহারি দোকানের মতই রংবেরংয়ের শিশি আর কাগজের প্যাকেট দেখতে বড়ই ভালো লেগেছিল অঞ্জনার। ভালো লেগেছিল কাউন্টারের পিছনে দাঁড়ানো ছাই রঙের ট্রাউজার-পরা ছিটের সার্ট গায়ে তার মালিককে। মাথায় কোঁকড়ানো চুল, লম্বা ছিপছিপে চেহারা, গায়ের রঙ কালো, নাক মুখের গড়ন এমন কিছু ধারালো নয়, তবু দেখতে ভালো লেগেছিল তাকে। স্কুলে যাতায়াতের পথে রেবা আর অঞ্জনা দুজনেই তাকে আড়চোখে দেখত। দুজনেই তখন সবে ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছে। তাদের ক্লাসের অনেক

মেয়ে তখনো ফ্রক পরে স্কুলে আসে যায়। কিন্তু অঞ্জনা আর রেবার বাড়ন্ত গড়ন বলে—। বাড়ন্ত গড়ন বলে তাদের বাবা-মার যতই ভাবনা হোক তাদের নিজেদের মোটেই তা নিয়ে দুশ্চিন্তা ছিল না। বরং পাড়ার সবাই তাদের সম্বন্ধে হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠেছে দেখে তারা বরং খুসিই হল। পাড়ার মুদি স্টেশনারি দোকানের মালিক আর ওই মুখার্জী ড্রাগসের শুধাংশুদা তাদের দেখলে প্রত্যেকেরই চোখ মুখের ভাব আজকাল বদলে যায়—অঞ্জনারা তা লক্ষ্য করে আনন্দ পেয়েছে।

তারপর শুধু আড়চোখে দেখাই নয়, সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে দেখাশোনা, কথা বলা এবং কথা শোনার সময়ও এল। রেবার মা প্রায়ই মাথা ধরায় ভোগেন। স্কুল থেকে ফেরার পথে তাঁর জন্যে একটা অ্যাসপ্রো নিয়ে যাওয়া দরকার। রেবা বলল, 'তুই বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবি কেন। আয়না, আমি আগেও ওঁর দোকান থেকে কত ওষুধ কিনেছি।'

সুধাংশুবাবু অ্যাসপ্রো ট্যাবলেট দিলেন, দাম নিলেন। তারপর হেসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্পও করলেন খানিকক্ষণ। তাদের কার কি নাম, কে কোন্ ক্লাসে পড়ে, দুজনের রোল নাম্বার পাশাপাশি কিনা, তারা কি কাছাকাছি বসে না দূরে দূরে এসব খুঁটিনাটি ব্যাপার জানবার জন্যেও সুধাংশুবাবুর কী আগ্রহ। কিন্তু শুধু কি তাঁরই জানবার আগ্রহ ছিল, অঞ্জনার জানার আগ্রহ ছিল না। তারও কি ভালো লাগছিল না কথা বলতে? আর একজনকে খুসি হতে দেখে সেও কি খুসি হয়ে উঠছিল না? অঞ্জনা সেদিনই কি বুঝতে পারেনি সুধাংশুবাবুর মনোযাগ তার দিকেই বেশি? সে যে রেবার চেয়ে দেখতে বেশি সুন্দরী চালাক চতুর, ভালো কথা বলতে পারে একথা জানতে তার বাকি ছিল না। অনেকের মুখেই এ কথা অঞ্জনা শুনেছে। সুধাংশুবাবু তাকে মুখে সে কথা বললেন, কিন্তু ব্যবহারে সব বুঝিয়ে দিলেন।

রেবার মার মাথা ধরার ওষুধ কিনতে এসে অঞ্জনা সেই যে ধরা পড়ে গেল, নিজেকে পুরোপুরি আর কি সে ছাড়িয়ে আনতে পেরেছে।

তারপর বৃষ্টি বাদলের দিনে ছুজনে গিয়ে ওষুধের দোকানে আশ্রয় নিয়েছে অঞ্জনারা। তাদের রোদে পুড়তে দেখলে আরো কষ্ট হয়েছে সুধাংশুদার। ডেকে বলেছেন, 'এসো ভিতরে এসো।' অতিথিদের শুধু বসতে দিয়ে নিশ্চেষ্ট থাকেননি গরমের দিনে ডাব আর সরবৎ, শীতের দিনে গরম চা। সুধাংশুবাবু ততদিনে সুধাংশুদা হয়ে গেছেন, ছুজনেরই পরম আত্মীয়। মাসতুতো ভাই। পাত্র গোত্র মিলিয়ে কে আর দেখতে যায়?

রেবা কিন্তু মাঝে মাঝে খোঁচায়, 'আমি কিন্তু বলে দেব।'

'কী বলে দিবি?'

'তুই বড় বেশি মাখামাখি করছিস সুধাংশুদার সঙ্গে। আমি যেদিন স্কুলে যাইনে তোর সেদিন আরো মজা হয়। একেবারে সরাসরি ভিতরে চলে গিয়ে নিরিবিলিতে গল্প করিস।'

অঞ্জনা প্রতিবাদ করে বলত, 'যাঃ বাজে কথা।'

অবশ্য সবই বাজে কথা ছিল না। কিন্তু সব সত্যই কি সকলের কাছে স্বীকার করা যায়? বন্ধুর কাছে করা যায় না, বাবা মার কাছে করা যায় না এমন কি নিজের কাছেও নয়।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেওয়ার আগেই রেবার বিয়ে হয়ে গেল। রেবা বাঁচল। তার ঈর্ষা হিংসা আর স্পাইয়িং এর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে অঞ্জনাও বেঁচে গেল। কিন্তু সেই বাঁচা যে আসলে বাঁচা নয়, সে যে মৃত্যুরই আর এক বিকল্প তা কি তখন অঞ্জনা বুঝতে পেরেছিল?

বাবা মা রক্ষণশীল ছিলেন না। অঞ্জনা তাঁদের একমাত্র সন্তান বলে বাড়িতে তার প্রতিপত্তিও যথেষ্ট ছিল। তবু সুধাংশুর সঙ্গে যখন বেশি মেলামেশার কথাটা তাঁদের কানে গেল তাঁরা খুসি হলেন না। বাবা গম্ভীর মুখে বললেন, 'তুমি ওখানে আর যেতে পারবে না।

সাধারণ একজন কেমিষ্ট। চাল নেই চুলো নেই। বয়সে কত বড়। তার সঙ্গে তোমার এত কী কথা?'

অঞ্জনা বলল, 'বাঃ, আমি তো ওষুধ কিনতে যাই। তাছাড়া মানুষের সঙ্গে মানুষের কি আলাপ থাকতে পারে না?'

মা বললেন, 'না, ওর মত লোকের সঙ্গে তোর আবার কিসের আলাপ? আমি খোঁজ-খবর নিয়েছি। কেউ বলে না ওর স্বভাব চরিত্র ভালো।'

অঞ্জনা প্রতিবাদ করে বলল, 'মা, লোকে কতজনের নামে কত মিথ্যে কথা বানিয়ে বলে। তুমি কি সব বিশ্বাস করতে চাও?'

মা বললেন, 'থাক থাক, তোকে আর সাফাই গাইতে হবে না। কপাল যে পুড়েছে তা আমি তোর ধরণ-ধারণ দেখেই বুঝতে পেরেছি।'

অঞ্জনা ভিতরে ভিতরে জ্বলে উঠল। কারণ তখনো তাদের মধ্যে কিছুই হয়নি। শুধু দেখাসাক্ষাৎ কথাবার্তা, কাছে বসে বসে গল্প করা। কি বড় জোর বাইরে কোথাও দেখাসাক্ষাৎ হয়ে গেলে রেষ্টুরেণ্টে মুখোমুখি বসে চা খাওয়া। কি সামান্য টুকিটাকি উপহার বিনিময়। বিনিময় নয়। সুধাংশু একাই দিত। কোন দিন একটা ফুল, কোনদিন একখানা টুকটুকে লাল রঙের ডায়েরি, কি নীলরঙের মোটা একটা খাতা। বলত, 'এতে তোমার গান লিখো।'

অঞ্জনা তখন গান গাইত, ওই বয়সে সব মেয়েই যেমন গায়। একটা গানের স্কুলে নাম ছিল। খুসি হলে যেত, খুসি না হলে যেত না।

কিন্তু এইটুকু মেলামেশাও মার সইল না। তিনি যা তা বলতে লাগলেন। নিজের মা নয়, সংমা। অঞ্জনাকে অসতী বানাতে দেরি করলেন না। তারও জেদ চেপে গেল। 'যাব ওঁর কাছে, বলব ওর সঙ্গে কথা, বেড়াব ওঁর সঙ্গে, নেব ওর দেওয়া উপহার। দেখি মা আমার কী করতে পারে।'

কে জানে মা অত বাড়াবাড়ি না করলে অঞ্জনা হয়তো অতখানি জড়িয়ে পড়ত না।

বাড়িতে চূড়ান্ত শাসন চলতে লাগল। বাবার চেয়ে মা শাসন করেন বেশি। চুল ধরে টানেন চড়-চাপড় দেন। খাওয়া দেব বন্ধ করে। বাবা কিছু বললে মা প্রথমে প্রাণপণে ঝগড়া করেন, তারপর কচি মেয়ের মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদেন। দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী। সব সময় স্ত্রী হয়ে থাকেন না। সুযোগ পেলেই আদরিণী নন্দিনী সেজে বসেন। নিজের তো ছেলেমেয়ে কিছু হয়নি। সুবিধে মত নিজেই নিজেদের মেয়ে হন, কখনো বা বাবাকে কচি ছেলের মত আদর করেন। তখন রাগ হত, এখন সেই মার জন্যও দুঃখ হয় অঞ্জনার।

মেয়ের জন্যে বাবা-মা পাড়া বদলালেন। টালীগঞ্জ ছেড়ে চলে গেলেন একেবারে পার্কসার্কাসে। কিন্তু তাতে কি কোন খেলা বন্ধ হল? খেলার তো সবে শুরু।

ম্যাট্রিকুলেশন পাস করবার পর মা তার বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অঞ্জনা জোর করে ভর্তি হল আই. এস-সি ক্লাসে। বাবাকে বলল, 'তুমি যদি টাকা না দাও আমি আমার হার আর বালা বিক্রি করে ভর্তি হব। তারপর টিউশনি করে পড়ব।'

আই. এস-সি. পাস করে ওই একই ভয় দেখিয়ে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হল অঞ্জনা। ওভারসিয়ারিতে জমি আর বাড়ির কনট্রাকটরি করে বাবার যা আয় হত তাতে একটি কেন তিনটি মেয়েকে ডাক্তারি পড়াতে পারতেন বাবা।

মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়ে কী যে আনন্দ হল অঞ্জনার তা সে নিজেই জানে। ডাক্তার হাওয়ার ইচ্ছা শুধুতো তার নিজের নয়, আরো একজনের। নিজের ইচ্ছার চেয়েও সে ইচ্ছায় বেশি উদ্দীপনা, বেশি মাধুর্য।

সুধাংশু বলেছিল; 'আমি তো ডাক্তার হতে পারলাম না। তুমি হও। সেই হওয়ার মধ্যে আমিও থাকব।

অঞ্জনা হেসে বলেছিল, 'তুমিই বা কেন হতে পারলে না? পড়াশুনোয় মন লাগল না? না কি মড়া কাটতে গিয়ে ভয় পেয়ে ফিরে এলে?

ততদিনে সুধাংশু তার কাছে তুমি হয়ে গেছে। সে নিজেই অঞ্জনাকে দিয়ে বলিয়ে নিয়েছে। অঞ্জনারও কোন আপত্তি নেই। সব সংকোচ, সব লজ্জা, সব ভয় সে কাটিয়ে উঠেছে। আড়াল করবার আর কিছু নেই, গোপন করবারও নয়। আজ ভেবে অবাক হয় অঞ্জনা, কী করে অত তাড়াতাড়ি নিজেকে আর একজনের কাছে অমন করে সে সঁপে দিতে পারল? তখনো সুধাংশু মুখুয্যের কতটুকুই বা সে জানে? এইটুকুই শুধু জেনেছিল তার আর কেউ নেই। শুধু আছে ওই ছোট ডিসপেনসারিটুকু, হাজরা রোডে মেসের একটি ঘর, আর আছে অঞ্জনা। এর চেয়ে বেশি কিছু জানবার তার দরকারই কি ছিল? তখন অঞ্জনার যা বয়স তাতে ওইটুকু পরিচয়ই যথেষ্ট। ওর চেয়ে কম হলেও যেন কোন ক্ষতি ছিল না। তখন সমস্ত পরিচয় দৃষ্টিতে হাসিতে, কথার পর কথা বলে যাওয়ায় যে কথার উদ্ভব হয়েছে শুধু হৃদয়কে ধরে দেওয়ার জন্যে, যে কথার মধ্যে জীবনের সব সুধা ভরে রয়েছে।

সুধাংশু বলেছিল টাকার অভাবে তার পড়া বন্ধ হয়ে গেছে। বাবা মারা যাবার পর খরচ চালাবার মত কেউ আর রইলেন না, তাই সুধাংশুকে বিদ্যা ছেড়ে অর্থ অর্জনের দিকে মন দিতে হয়েছে।

কিন্তু মেডিক্যাল কলেজে গিয়ে নার্স নীলিমার সঙ্গে আলাপ হল। তার কাছে কথায় কথায় সুধাংশুর কথাও তুলল অঞ্জনা। সে বলল ভিন্ন উপাখ্যান। লতা নামে একটি নার্সের সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠতা করতে গিয়েই নাকি সুধাংশু ফোর্থ ইয়ার থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। সেই লতা আর বেঁচে নেই, মরে গেছে সুধাংশুর জন্য। নীলিমার এই কথায় অঞ্জনার নিজেরও যেন মৃত্যু হল। যে কথার মধ্যে অমৃত সেই

কথার মধ্যেই বিষ। কথা তো আধার ছাড়া আর কিছু নয়। বিষ আর অমৃত মিশিয়ে রাখবার আধার।

দুচার দিনের মধ্যে পারল না, দু'চার সপ্তাহের মধ্যেও নয়।

মাস খানেক কেটে যাওয়ার পর অঞ্জনা একদিন আস্তে আস্তে কথাটা পাড়ল।

'তুমি কি আমাদের নার্স নীলিমাকে চেন?'

'না তো।'

'আর তার বন্ধু লতাকে?'

না। সুধাংশু কাউকেই চেনে না। নীলিমা বলতে সে শুধু আকাশের নীলিমাকেই বোঝে। লতা বলতে বোঝে তাকেই যার ইংরেজী হল ক্রীপার, সংস্কৃত ব্রততী, বল্লরী। অঞ্জনা আর এই নিয়ে কথা বাড়াল না। মনে মনে ভাবল নীলিমার কথা যদি সত্যিই হবে তাহলে কি আর সুধাংশু নিজে শখ করে তাকে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হতে বলে? তার কি আর ধরা পড়বার ভয় নেই? নীলিমার সুধাংশু নিশ্চয়ই অন্য সুধাংশু।

অঞ্জনা আস্তে আস্তে কথাটা ভুলে গেল। বাবা মারা গেলেন। ঘরে শরিক হয়ে অঞ্জনা রইল বাড়িতে।

ছোট মামা আর মামী এলেন দেখা-শোনার ভার নিতে। তাঁরা রয়ে গেলেন। রঞ্জনা রইল না। হোস্টেলে চলে এল। কিছু টাকা বাবা তার নামে আলাদা করে ব্যাঙ্কে রেখে গিয়েছিলেন। বাৎসল্যের শেষ চিহ্ন। সেই টাকা ভেঙে খরচ চলতে লাগল।

সুধাংশু বলল, 'ভেব না। এখন আমিও কিছু খরচ তোমাকে দিতে পারি।'

কিছু কেন, অঞ্জনার সব ভার বহন করবার অধিকারই সুধাংশুর আছে। আগে শুধু অধিকার ছিল এখন সামর্থ্যও। টালিগঞ্জের সেই ওষুধের দোকান বিক্রি করে দিয়ে চৌরঙ্গী অঞ্চলের বড় ফার্মেসীর মালিক হয়েছে সুধাংশু। পুরো মালিক নয়, শরিক। কিন্তু তাই

বা কি করে হল ? কী করে জানবে ? সুধাংশু সব কথা তাকে খুলে বলে না। বলে, 'ওসব জেনে তোমার কাজ নেই। তুমি ছাত্রী, পড়াই একমাত্র তপস্যা।'

কিন্তু তপস্যায় পুরোপুরি মন দিতে পারে কী করে অঞ্জনা। সুধাংশু নাকি ভেজাল ওষুধ বিক্রি করে বড়লোক হয়েছে। সে নাকি এক প্রৌঢ়া বিধবার কাছ থেকে টাকা পেয়েছে। তাঁর আর কেউ নেই। আছে শুধু বাড়ি গাড়ি বিষয় সম্পত্তি এবং কাউকে কাউকে সেই সম্পদের অংশ দেওয়ার মত ঔদার্য। নানা কথা নানা গুজব সুধাংশুর নামে রটতে অঞ্জনা বলল, 'এ সব কি শুনছি ?'

সুধাংশু বিরক্ত হয়ে বলল, 'তুমি যদি ওই সব শুনে বেড়াও পড়বে কখন ? তোমার এখন শুধু শোনা উচিত প্রফেসারদের লেকচার। আর কোন কথায় কান দেওয়া উচিত নয়। এই তো তোমার ফাইন্যাল ইয়ার।'

সুধাংশু তাকে আজকাল এমনি করে ধমকায়, আর উপদেশ দেয়। সমালোচনা শুনলে বিরক্ত হয় সুধাংশু। অর্থ কি মানুষের স্বভাবকে এমনি করে বদলে দেয় ? নাকি বদলাবার বীজ তার ভিতরেই থাকে অর্থটা উপলক্ষ্য মাত্র।

অঞ্জনা বলে, 'তোমার কাছে নাকি আরো অনেক মেয়ে যায়। তোমার চেম্বারে সেদিন একজনকে দেখলাম। বেয়ারার নিষেধ না শুনে হঠাৎ গিয়ে ঢুকে পড়েছিলাম তাই আর সামলাতে পার নি।'

সুধাংশু জবাব দিয়েছে 'সামলাবার কি আছে ? ওষুধ কিনতে আমার ফার্মেসীতে যারা যায় তাদের মধ্যে মেয়েও আছে পুরুষও আছে। যারা যায় তারা নিজের গরজেই যায়। বেরিয়ে এসে তারাই আবার দুর্ণাম করে। যারা জনতা থেকে দু'এক ধাপ ওপরে উঠে দাঁড়ায়, এ দুর্ণাম তাদের সহ্য করতে হয় অঞ্জু। ওতে কান দিতে নেই।'

পুরুষের নিষ্ঠুরতার বুঝি শেষ নেই, তার নৃশংসতার।

এরপর আর পড়াশুনা করবার ইচ্ছা অঞ্জনার ছিল না। পরীক্ষাও বন্ধ করে দেবে ঠিক করেছিল, কিন্তু কয়েকটি সহপাঠিনীর পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা দিল, আর আশ্চর্য, পাশও করে গেল।

খবর পেয়ে সুধাংশু নিজেই দেখা করতে এল। বলল, 'খুব খুশি হয়েছি। আমার ফার্মেসী করাটা এবার সার্থক হয়। কী প্রাইজ চাও, বল।'

অঞ্জনা সব দুঃখ, সব লাঞ্ছনার কথা ভুলে গিয়ে বলল, 'সেই প্রথম দিন থেকে যা চেয়েছি, যাকে চেয়েছি, তার চেয়ে বড় প্রাইজ আমার আর কি আছে? এবার একটা ব্যবস্থা-ট্যাবস্থা করে ফেল। কতদিন আর এই হস্টেলে পড়ে থাকব?

পাশ করার খুশিতে সুধাংশুর সেই আকস্মিক দাক্ষিণ্যে অঞ্জনা কি ভাবেই না উদ্বেলিত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। ভাবতেও আজ লজ্জা করে।

একটু চুপ করে থেকে সুধাংশু চায়ের কাপের মধ্যে ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে আস্তে আস্তে বলেছিল, তোমাকে একটি কথা বলা হয়নি অঞ্জনা। বলি বলি করেও বলতে পারিনি। গাঁয়ের বাড়ীতে আমার একটি স্ত্রী আছে। ঠিক পুরোপুরি নেই। থাকা না থাকার সীমায় আছে। তাই তার কথা আমার বেশি মনে থাকে না। এর আগে দুবার আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করেছিল। মায়া-মমতায় আটকে আটকে একেবারে বেরিয়ে যেতে পারেনি। শুধু কোন কোন অঙ্গ গেছে। তৃতীয়বার চেষ্টা করলে আর একটি অঙ্গ বিকল হবে মাত্র।'

অঞ্জনা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে রেস্টুরেন্টের অ্যাসট্রেটা সুধাংশুর কপালে ছুঁড়ে মেরে বলেছিল, 'তুমি এত বড় পশু।'

যেন ছাইদানি নয়, পুষ্প স্তবক, তেমনি করে সেই তামার আধারটি দুহাতে সুকৌশলে ধরে ফেলে সুধাংশু হেসে বলেছিল, 'তুমি কত বড় একটি শিশু, তাই দেখছি।'

অঞ্জনা তারপর থেকে সুধাংশুর মুখ দেখেনি। সুধাংশু বারবার

চেষ্টা করেছে, তবু না। একদিন অঞ্জনা নিজেই সেধে দেখা করতে গিয়েছিল, আজ তার সঙ্গে দেখা করা সুধাংশুর সাধ্যের বাইরে।

এর ফলে প্রথম প্রথম সুধাংশু আরো বিগড়ে গিয়েছিল। বাড়িয়ে দিয়েছিল অত্যাচারের তোপ। পার্টনারকে হীন চক্রান্তে সরিয়ে দিয়ে তাঁকে সর্বস্বান্ত করে নিজের ঐশ্বর্য আর আধিপত্য বাড়িয়ে দিল।

তারপর আস্তে আস্তে তার জীবনেরও মোড় ফিরেছে। সে নাকি আজকাল দান করে, ধ্যান করে। দান করে তো ভেজাল ওষুধ। ধ্যান করে কার কে জানে? সেই বিকলাঙ্গ স্ত্রীকে কলকাতার বাড়ীতে আনিয়ে নিয়েছে। ছেলে-মেয়েও এসেছে তাঁর কোলে। বেটার লেট দ্যান নেভার।

কী করে অঞ্জনার এই নার্সিং হোমের খোঁজ পেয়েছে সুধাংশু। তার পক্ষে সবই সম্ভব। অঞ্জনা কলকাতার বাইরে এতদিন অজ্ঞাতবাসে ছিল। আবার একটি হাসপাতালের ভার নিয়ে বাসা বেঁধেছে কলকাতায়। যারা একবার এই শহরের স্বাদ পেয়েছে বাইরে কোথাও গিয়ে কি তার আর মন টেকে?

খোঁজ পাওয়ার পর থেকে রোজ একবার করে ফোন করে সুধাংশু। তার সেই বিরাট ফার্মেসীতে রাত এগারটা পর্যন্ত কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তারপর সকল কর্ম অবসানে একটি ফোন করে যায়। তার গলা শুনলে মনেই হয় না যে সেই সুধাংশু, সেই জবরদস্ত নিষ্ঠুর নৃশংস পুরুষ। অন্তত কণ্ঠে ভারি ক্লান্ত মনে হয় সুধাংশুকে। ক্লান্ত আর করুণ। এ কি দিনের ক্লান্তি, শ্রমের ক্লান্তি না বয়সের ক্লান্তি? জেনে কি হবে? জানবার আর ইচ্ছা নেই অঞ্জনার।

অঞ্জনা কতদিন ভেবেছে পুলিশে খবর দিয়ে সুধাংশুকে ধরিয়ে দেবে। এত রাত্রে একজন মহিলাকে বিরক্ত করে সে কোন্ সাহসে? কিন্তু সুধাংশু কি পুলিশকে ভয় করে? মিছামিছি তাতে কেলেঙ্কারী

বাড়বে। তার চেয়ে ফোনটা এ ঘর থেকে সরিয়ে নীচে নামিয়ে দিতে হবে। সুধাংশুর স্বর যেন তার আর নাগাল না পায়?

কী চায় সুধাংশু? তার উদ্দেশ্য কী? সে কি সত্যই অঞ্জনাকে আর কারো গৃহিণী দেখতে চায়? বাজে কথা, অঞ্জনা মরলেও বিশ্বাস করে না। কোন পুরুষ তা চাইতে পারে না। সুধাংশু এই অছিলায় শুধু তার সঙ্গে কথা বলতে চায়, কথা শুনতে চায়। সুধাংশু একদিন বলেছিল, 'তোমার গলার স্বর বড় মিষ্টি। এত মিষ্টি গলা আমি আর কোথাও শুনিনি। তোমার ওই গলার জন্যে আমি সব দিতে পারি।'

আশ্চর্য, আজও কি তাই মনে করে নাকি সুধাংশু? তবু তো গলা নয়, শুধু ফোনের গলা!

চেয়ার ছেড়ে বিছানার দিকে এগিয়ে এল অঞ্জনা। আর রাত জেগে লাভ নেই। কাল অনেক কাজ। তার মধ্যে একটি মেজর অপারেশন আছে।

।। রেখা ।।

অফিস থেকে এসে একখানি বিয়ের নিমন্ত্রণের চিঠি পেলাম। খামের ওপরে মঙ্গলশঙ্খ, বাসন্তী রঙের চিঠির ভিতরে প্রজাপতি পাখা মেলে রয়েছে। আগাগোড়া সোনার জলে ছাপা। হঠাৎ কালো কালির একটি লাইন চোখে পড়ল; 'আপনার সঙ্গে কথা আছে। আপনি কিন্তু আসবেন। ইতি আপনার স্নেহধন্যা রেখা।'

আর কিছু না পড়লেও চলে। রেখার বাবা ভবেশ চক্রবর্তীর জবানীতে বিয়ের গতানুগতিক নিমন্ত্রণের চিঠি। সবান্ধব যাওয়ার অনুরোধ। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটি যে মার্জনার যোগ্য তার উল্লেখ।

চিঠি পড়ে আমার স্ত্রীকে বললাম, 'যাক্ বিয়েটা হল শেষ পর্যন্ত। ওর বাবা মা অনেকদিন ধরে চেষ্টা করছিলেন। একটা সম্বন্ধ নাকি হতে হতে ভেঙে গেল।'

স্ত্রী বললেন, 'ভাঙেনি গো। সেইটাই শেষে জোড়া লেগেছে। ওর মামা বলছিলেন। পাত্র নাকি শেষে নিজেই রাজী হয়েছে। হবে না? মেয়েতো সুন্দরী। রূপে সব ঢেকে যায়।'

আমি চুপ করে রইলাম।

স্ত্রী বললেন, 'শোন, তোমার কিন্তু যাওয়া চাই। আমি যেতে পারব না। আমার অন্য কাজ আছে। রেখার মামা বিশেষ করে বলে গেছেন। কেন রেখাও তো তোমাকে আলাদা করে কী যেন লিখেছে। বাবা, এত ভাব এত চিঠি পত্তর, এবার সব শেষ।'

আমার স্ত্রী একটু ঠাট্টা করলেন। ঠাট্টা করতে পারলে মেয়েরা কেউ ছাড়ে না।

চিঠি অবশ্য রেখা লিখত। অনেক দিন আগে থেকেই লিখত। যখন ও থার্ড-ক্লাসে পড়ে তখন থেকে। তারপর ও স্কুল থেকে কলেজে গেল। সেখানেও বছর তিনেক পড়ল। ওর চিঠি পত্রের ধরনধারা আর বিষয়-বস্তু বদলাতে লাগল। আমি সব লক্ষ্য করতাম। ইদানীং ও শুধু চিঠি লিখেই ক্ষান্ত হত না আর সেই সব গল্প ছাপবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠত। আমি ওকে পরামর্শ দিতাম, 'এখনই ছাপবার দরকার নেই। এখন শুধু চর্চা করে যাও। কিম্বা তোমার বন্ধু-বান্ধবদের ঘরোয়া বৈঠকে পড়ে শোনাও। তারপর লেখা যখন আর একটু পরিণত হবে তখন ভালো ভালো কাগজে পাঠিয়ো। তারপর আর তোমাকে নিজে থেকে লেখা পাঠাতে হবে না। সম্পাদ-কেরা তখন নিজেরাই তোমার লেখা চেয়ে নেবেন। ফুল মৌমাছির কাছে যায় না মৌমাছিরাই তার চার দিকে গুণগুণ করে।'

কিন্তু এসব উপদেশে কবি যশঃ প্রার্থিনী নবীন লেখিকার মন ভরবে কেন। রেখা অভিমান করে চিঠি বন্ধ করত আবার দ্বিগুণ অভিমানে দীর্ঘতর চিঠি লেখা স্রুরু করত। তখন চলত মসী যুদ্ধ। 'আপনাদের বুঝি প্রথম বয়সের লেখা ছাপা হয় নি? লেখা পকেটে করে আপনাদের বুঝি কাগজের অফিসে যেতে হয়নি? আপনাদের বুঝি প্রথম থেকেই পাকা লেখা ছাপা হয়েছিল?' এসব ব্যক্তিগত আক্রমণ হাসিমুখে সহ্য করা ছাড়া উপায় কি।

পরের চিঠিতে ফের মার্জনা ভিক্ষা, 'সেদিন মনের দুঃখে অনেক কথা লিখে ফেলেছি। রাগ করবেন না যেন। ক্ষমা করবেন।'

তারপর সেই সঠিক প্রশ্নমালা। অমুক-কাগজে অমুক লেখাটা বেরিয়েছে। তার চেয়েও কি রেখার লেখা খারাপ?' ইত্যাদি ইত্যাদি।

রেখা তখন বোধহয় ক্লাস নাইন কি টেনে পড়ে। ও যদি রাজরাণী ভূত-প্রেত কি চোর ডাকাতের গল্প লিখত আমি একটু ঘষে মেজে শিশুদের কোন কাগজে সুপারিশ করে পাঠাতে পারতাম। কিন্তু ও

লিখবে নরনারীর প্রেমের গল্প। দারুণ মনস্তত্ত্বমূলক প্রেম। আমি পড়ি আর হাসি। ওর গল্প পড়তে গেলেই ফ্রকপরা লেখিকাটি আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়।

রেখা আমার বন্ধু শুভেন্দু সান্যালের শ্যালিকা। সেই ওকে একদিন আমাদের বাড়িতে এনে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল, 'এই নাও, তোমার এক গুণমুগ্ধ পাঠিকা। শুধু তোমার কেন এখনকার সব লেখকেরই ও অনুরাগিনী। তোমাদের কোন এক-জনের নাম শুনলেই ওর জিভে জল আসে, চোখ উজ্জ্বল হয়।'

'তাই নাকি ?'

শুভেন্দু বলেছিল, 'হ্যাঁ, এই এক বয়স। এ বয়সটাই ভাল লাগবার বয়স। আর আমরা সব কিছু ভালো না লাগার বয়সের সীমানায় এসে পড়েছি। আমার এক ঠাকুরদা ভোরে উঠেই বলতেন, না হে কিছু ভালো লাগছে না। মুখটা শেষরাত থেকে সেই যে তামা তামা হয়ে আছে—কোন স্বাদ নেই। বয়সের দিক থেকে না হলেও মনের দিক থেকে আমি আমার ঠাকুরদা হয়ে পড়েছি। কোন রস পাইনে। তোমাদের এখনকার গল্প উপন্যাস আধুনিক মার্কা দেওয়া কবিতা গান আর ছবি সিনেমা আর থিয়েটার মোট কথা গোটা রসের জগৎ আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়েছে। সব যেন কটু তিক্ত কষায়ে এসে ঠেকেছে। তোমরাই নিরেস হচ্ছ, নাকি আমি নিরস হচ্ছি ঠিক বুঝতে পারছিনে।'

রেখা বলেছিল, 'উনি কি কিছু পড়েন যে বুঝবেন ? সব সময় অফিস নিয়ে ব্যস্ত। বড়দির মুখে সব শোনেন আর তা নিজের বলে চালিয়ে দেন। ওঁর সব শোনা বিদ্যে।'

আমি হেসে উঠলাম, 'ইস্ রেখা একেবারে হাটের মাঝখানে হাঁড়ি ভেঙ্গে দিলে।'

সেই আলাপ থেকে পত্রালাপের সুরু। বেশিদূরে যে থাকে তা নয়। বারাসতে ওদের বাড়ি। কিন্তু কলকাতায় আসা যাওয়া কম।

যখন তখন বাড়ি থেকে বেরোন ওর বাবা মা পছন্দ করেন না। আত্মীয় স্বজন কারো সঙ্গে ছাড়া ওকে বেরোতে দেননা। সিনেমা দেখা বারণ। কিন্তু এত কড়াকড়ি সত্ত্বেও ওর নভেল পড়া বন্ধ করতে পারে নি। লুকিয়ে লুকিয়ে ওসব নিষিদ্ধ বই পড়ে আর লিখে লিখে পাতা ভর্তি করে। শুভেন্দু বলে, 'ওর বাবা মা হাল ছেড়ে দিয়েছেন।'

কিন্তু শুভেন্দু দিল্লীতে বদলি হয়ে রক্ষা পেল। ইনকামট্যাক্স অফিসের বড় চাকুরে। ওতো আর শুধু বাঙালী নয়, সর্বভারতীয়। কলকাতা সহরের প্রান্তবাসী আমাকেই রেখার সব ঝামেলা এখন একাই পোহাতে হয়। ও তার অটোগ্রাফ খানা পাঠিয়ে দেয় আমাকে ওর প্রিয় লেখকদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে রাখতে হবে। ওদের পাড়ার লাইবেরীতে কিছু গ্রন্থদানের অনুরোধও মাঝে মাঝে আসে। আর লেখা আসার তো বিরামই নেই।

আমি রেহাই পাওয়ার জন্যে ওকে লিখলাম, 'তোমরা একটা হাতে লেখা কাগজ করো। তাতে তোমার লেখাগুলি বেরোতে থাকুক। সে কাগজ তো আমাদের এখানেও আসবে। অনেকের চোখে পড়বে আমিও তখন কাউকে কাউকে বলতে পারব।'

কথাটা রেখার মনে ধরল। হাতে লেখা কাগজের জন্যে পুরোদমে তোড়জোড় সুরু হয়ে গেল। আমাকে বলল কাগজের একটা নাম রেখে দিতে। আমি বললাম, 'রাখো না রূপ-রেখা।' নাম শুনে রেখা তো প্রথমে খুব খুশি। কিন্তু তার পরে ভেবে চিন্তে আরো দুচার জনের কাছ থেকে কিছু শুনেটুনে আপত্তি করতে লাগল, 'না না ও নাম চলবে না। ও নাম রাখলে আমার আর সম্পাদিকা হবার উপায় থাকবে না। সবাই বলবে নিজের নামে কাগজ নিজেই আবার সম্পাদিকা। বাধ্য হয়ে তখন পিলুদাকেই সম্পাদক করতে হবে।'

এই পিলুদার নাম আমি রেখার মুখে আরো মাঝে মাঝে শুনেছি। রেখার সে পরম বন্ধু। আসলে রেখার দাদারই বন্ধু ছিল। সেই

দাদা মারা গেছে। প্রফুল্লকে রেখার বাবা মা খুব স্নেহ করেন। কিন্তু প্রফুল্ল জীবনে তেমন উন্নতি করতে পারেনি। অবশ্য উন্নতি করবার সময় যায়নি। বয়সই বা এমন কি। বছর বাইশ তেইশের বেশি হবে না। কিন্তু পড়াশুনো বোধ হয় আর ওর হয়ে উঠবে না। কলেজে বছর দুই পড়ে কি একটা গোলমালে পড়া ছেরে দিয়েছে। ছোট একটি লণ্ড্রী চালায়। বিধবা মা আছেন। ছোট ভাইবোনও দু-একটি আছে। অতিকষ্টে সংসার চলে। কিন্তু যতই গরীব হোক প্রফুল্ল নামের আর একটি পরিচয় রেখার কাছে খুব বড়। প্রফুল্ল তাদের পাড়ার লাইবেরীর অবৈতনিক লাইবেরিয়ান। সংস্কৃতিচক্রের সেক্রেটারী। প্রফুল্ল অনেক বই পড়েছে। সস্তায় কলকাতার ফুটপাত থেকে বেছে বেছে বই কিনে নিজের বাড়িতেও একটা লাইবেরীর মত করে তুলেছে। শুধু তাই নয় ও নাকি লেখেও। গল্প কবিতা প্রবন্ধ সব নাকি ও লিখতে পারে। কিছু কিছু লেখা ছাপাও হয়েছে। তবে ছদ্মনামে। আমি একবার জিজ্ঞেস করে-ছিলাম, 'সেই ছদ্মনামটা কি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর?'

একথা শুনে রেখা খুব চটে গিয়েছিল, 'আপনি ভাবেন আপনি ছাড়া বুঝি আর কেউ লিখতে পারেনা?'

আমি হেসে বলেছিলাম, 'প্রত্যেক লেখকেরই তাই ধারণা। শুধু তিনিই লেখক। আর সব অলেখক। তোমার পিলুদাকে জিজ্ঞেস করে দেখ। সেও এই কথাই বলবে।'

প্রফুল্লকে আমি চাক্ষুষ বার কয়েক দেখেছি। ওদের সেই হাতে লেখা কাগজখানা আমাকে দেখাবার জন্যে একদিন এসেছিল। ছেলেটি কালো ছিপছিপে লম্বা। সুশ্রী নয় তবে মিষ্ট চেহারা। কথাবার্তায় বিনয়ী স্বভাবে নম্র। অন্য কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম বলে আমি ওর সঙ্গে বেশি কথা বলবার সময় পাইনি। আরো দু'একবার প্রফুল্ল এমনি অল্প সময়ের জন্যে এসেছে। কখনো ক্লাবের কাজে, কখনো রেখার ফরমায়েস খাটতে। আমার সঙ্গে মুখোমুখি আলাপ করতে

ওর বড় সঙ্কোচ। দু'চার কথা বলবার পরেই, 'আপনার কাজের ক্ষতি হচ্ছে' বলে প্রফুল্ল বিদায় নিয়েছে।

প্রফুল্লকে আমি আরো একভাবে দেখেছি। দেখেছি রেখার লেখার ভিতর দিয়ে। ওর যেসব গল্প পড়ে আমি মনে মনে হেসেছি, নতুন করে লিখবার উপদেশ দিয়ে ফেরৎ পাঠিয়েছি, দু একটা বা আমার দেরাজে পড়েও আছে। সেই সব গল্পের প্রায় প্রত্যেকটি নায়কই প্রফুল্ল। আমার চিনতে বাকী থাকেনি, প্রফুল্লের সঙ্গে আলাপ করবার আগেই আমি তাকে চিনেছি। রেখার নায়কেরা কখনো খুবই সুপুরুষ, কখনো বীরপুরুষ আর অধ্যবসায়ী। নিজের চেষ্টায় দৈন্য দূর করেছে, জীবনে সার্থক হয়েছে। কখনো বা বেশি বয়সে পড়াশুনো সুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়ে নামকরা কলেজে অধ্যাপনা পেয়েছে। আর যে মেয়েটি তাকে খুবই ভালোবাসে—নানা বাধা-বিঘ্ন ডিঙিয়ে সেই মেয়েটিকে সে বিয়ে করেছে। কখনো তার অসাধারণ বাহুবল, কখনো বা অসাধারণ বুদ্ধিবল। কখনো বা বাহুর সঙ্গে বুদ্ধি এসে যুক্ত হয়েছে। লক্ষ্য করতাম রেখার সব গল্পেরই অন্তে মিল। নানা ঝড়ঝঞ্ঝা ঝগড়া-ঝাটির পর শেষ পর্যন্ত নায়িকার সঙ্গে নায়কের মিলন হয়েছে। যেখানে মিলন হয়নি সেখানেও মিলনের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

রেখা আমাকে বলত, 'খেতে বসে যেমন আগে তিতে পরে মিঠে, গল্প পড়তে বসেও তেমনি আগে দুঃখ পরে সুখ। নইলে গল্প পড়ে যেন তেমন আরাম পাওয়া যায়না। কিন্তু আপনারা একেবারে উল্টোটি করে রাখবেন।'

হেসে বলি, 'এর পর থেকে তোমার মডেলে গল্প লিখব। যাতে তোমার মত মেয়েদের পড়ে আরাম হয়।'

রেখা জবাব দিয়েছিল, 'আহা মেয়ে বলে যেন আর গায়ে লাগেনা। আমরা ছাড়া আপনাদের গল্প পড়ে কারা? আর তো সব জামাইবাবুদের মত পাঠক। মানে একেকটি ঠক।'

কথায়বার্তায় মেয়েটি একটু পাকা কিছু অকালেই পেকেছে। কী আর করা যায়। অমৃতং বালা ভাষিতং মনে করে হাসি।

কলেজে ঢুকবার পর থেকে রেখার বেশ সাহস বেড়েছে। শুধু পত্রাঘাত করেই ক্ষান্ত থাকে না। সশরীরে এসে আমার বাড়িতে এসেও হানা দেয়। সেনাদলে কখনো কোন সহপাঠিনী, কখনো বা পাড়াতুতো কোন দিদি বউদি। শুধু আমার কাছেই আসেনা। কলকাতায় ওর নানারকমের কাজ থাকে। সিনেমা, মার্কেটিং, দিদি বউদিদের গয়নার ডিজাইন পছন্দ করে দেওয়া। কাজের কি সীমা সংখ্যা আছে।

একেকদিন বলি, 'তুমি যে এমন করে ঘোরাঘুরি করো তোমার বাবা মা আপত্তি করে না?'

রেখা বলে, 'বারে, আপত্তি করবেন কেন। আমি বড় হয়ে যাইনি?'

হেসে বলি, 'সেই সঙ্গে ওঁদের ভয়ও তো বড় হয়েছে।'

রেখা লজ্জায় মুখ নামায়।

গত বছর শুভেন্দু কলকাতায় এসেছিল। একদিন রেখা আর তার বাবা রাজেনবাবু দুজনকে সঙ্গে নিয়ে এসে হাজির। কলকাতায় কী সব জিনিসপত্র কিনতে এসেছেন। পরে আমার সঙ্গে আলাপ করতে এলেন রাজেনবাবু। বেশ লম্বা চওড়া ভারিক্কি চেহারা। বয়স ষাটের কাছাকাছি। মাথায় বিরাট টাক। শুনেছি আদালতে পেসকারি করেন। আরো ভালো পোষ্টে তাঁকে মানাত। শুভেন্দু আর রেখা ভিতরে চলে গেল। রাজেনবাবু আমার সঙ্গে বসে আলাপ করতে লাগলেন। তিনি আমার কথা রেখার মুখে আর তাঁর জামাইয়ের মুখে অনেক শুনেছেন। বইটইও পড়েছেন কিছু কিছু। তবে গল্প, উপন্যাস এই বয়সে আর তেমন ভাল লাগে না। বড় হালকা বড় জোলো জোলো মনে হয়। তারপর রেখার কথা উঠল। তার এই অতি চঞ্চল মেয়েটিকে আমি খুব স্নেহ করি এ তাঁর

সৌভাগ্য।' তিনি আশা করেন আমি তাকে সব সময় সৎবুদ্ধি আর সুপরামর্শই, দেব। জীবনের এই সময় উপযুক্ত গাইডেন্‌স দরকার। আমি একটু হেসে চুপ করে রইলাম।

তিনি বললেন, 'আপনার তো অনেক জানাশুনো। দিন না একটি ভালো ছেলেটেলে দেখে। সচ্চরিত্র, স্বাস্থ্যবান আর লেখাপড়ায় অন্তত পক্ষে গ্রাজুয়েট—নইলে তো মশাই আজকাল হাতের জলই শুদ্ধ হয় না। তাছাড়া মেয়েদেরই কি মন ওঠে? আর একটু ভাল চাকরি যাতে লোকের কাছে বলা যায়। আর তার নিজের একটা আস্তানা। খাওয়া-পরার চিন্তাটা না থাকে আর মাথা গুঁজবার একটু স্থান থাকে—বাস। তারপর মেয়ের ভাগ্য। বিয়ে ব্যাপারটাই ভাগ্য। সুখী হওয়া না হওয়া সব অনিশ্চিত। মানুষ শুধু চেষ্টা করে যেতে পারে। দেওয়ার সময় একটু দেখে শুনে দিতে হয়। এই পর্যন্ত—'

বললাম, 'অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? রেখা বি, এ টা আগে পাশ করুক।'

রাজেনবাবু বললেন, 'না মশাই, বি, এ, পাশ করলে আরো উঁচুদরের জামাই আনতে হবে। অত দর আমি দিতে পারবনা।' তারপর একটু হেসে বললেন, 'আপনার মেয়ে নেই। কন্যাদায়ের ভাবনা আপনাকে ভাবতে হবে না। শুধু মানস-কন্যাদের নিয়ে কারবার। কলমের খোঁচায় তাদের আপনি যেখানে খুশি সেখানে বিয়ে দিতে পারেন। খরচ খরচা লাগেনা। জাতকুলের ভাবনাও নেই। শুনেছি কোন কোন মেয়ের নাকি আপনি দুবার করে বিয়ে দিয়ে থাকেন। আমরা তো মশাই একটি মেয়েকে একবার পার করতেই হিমসিম খেয়ে যাই।'

ভদ্রলোক হাসতে লাগলেন। দেখলাম প্রথমে ওঁকে যত গুরুগম্ভীর বলে মনে হয়েছিল তা তিনি নন। তিনি হাসতে পারেন, হাসাতে পারেন, শুদ্ধ পরিহাস করতেও কম পারেন না।

ওঁরা চলে গেলেন। এর কিছুদিন পর থেকেই রেখার বিয়ের কথাবার্তা খুব চলতে লাগল। রেখার দিদি সুলেখাও স্বামীর সঙ্গে একদিন বেড়াতে এসে বলে গেল রেখার জন্যে পাত্র প্রায় ঠিক হয়েই আছে। বাবা পছন্দ করে রেখেছে। জামসেদপুরের টিন প্লেটে কাজ করে। বি, এস, সি পাশ করে ঢুকেছিল। এখন আছে ফোরম্যানের পোষ্টে। রেখার বাবা যা চেয়েছিলেন তাই পেয়েছেন। ভালো বংশ ভালো চাকরি। ছেলের স্বাস্থ্য আছে, চরিত্র আছে, কলকাতায় পৈতৃক বাড়িও আছে। শুধু দেখতে তেমন সুন্দর নয় আর বয়সটা তিরিশের কাছাকাছি। কিন্তু সব আর এক সঙ্গে কোথায় মেলে। কিন্তু রেখার আর কিছুতে মন উঠছে না। সুলেখা যাওয়ার সময় বলল, 'আপনি ওকে একটু বুঝিয়ে-টুজিয়ে বলবেন তো। বাবা হার্ট ডিজিজের রোগী। এরই মধ্যে একবার অ্যাটাক হয়ে গেছে। কবে আছেন কবে নেই। রেখার বিয়ে দিয়ে তিনি একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে চান। রেখাকে নিয়েই ওর যত দুশ্চিন্তা। মার শরীরও ভাল না। বাতে নড়াচড়া করা তাঁর পক্ষে শক্ত। রেখাকে নিয়েই তাঁর যত অশান্তি। ও তো আপনার কথা শোনে। আপনি একটু ওকে বুঝিয়ে-টুজিয়ে—।'

আমি এপক্ষকেও বোঝাতে গেলাম না। ওপক্ষকেও টোজাতে গেলাম না। আমি তেমন ভাবে কথা বলতে জানিনে যাতে কোন পক্ষই বুঝবে।

এর মধ্যে এক কাণ্ড ঘটল। রেখা আর প্রফুল্ল একসঙ্গে এসে হাজির। বেলা তখন প্রায় এগারটা। বিয়ের কনের খুব তো সাহস। প্রফুল্ল এসে আমার বইয়ের আলমারি দেখতে লাগল, র‍্যাকের মাসিক সাপ্তাহিকের স্তূপটা নাড়াচাড়া করতে লাগল। যেন আর কোন তার কাজ নেই, উদ্দেশ্য নেই। আর রেখা এসে চুপ করে আমার লেখার টেবিলের দিকের চেয়ারটায় এসে বসল।
'লিখছেন ?' বললাম, 'হ্যাঁ।'

'নতুন গল্প ?'

হেসে বললাম, 'আমি তো নতুন ভেবেই লিখি। লোকে হয়তো ভাবে পুরোন।'

আমি ফের লিখতে লাগলাম।

সাহিত্যের আলোচনায় রেখার আজ মন নেই, বলল, 'আপনি কি খুব ব্যস্ত ?'

বললাম, 'হ্যাঁ, গল্পটাকে শেষের মুখে এনেছি।'

রেখা চট করে উঠে দাঁড়াল, 'আপনি তাহলে শেষ করুন। আমরা চলি। আপনাকে অনর্থক ডিস্টার্ব করে গেলাম।'

আমি বললাম, 'আরে না না বোসো বোসো।'

কিন্তু রেখা আর বস্‌ল না। প্রফুল্লও হেসে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিয়ে বলল, 'গল্পটা কোথায় বেরোয় জানাবেন কিন্তু।'

ওরা চলে যাওয়ার পর আমার স্ত্রী বললেন, 'ওরা বোধ হয় রেজেষ্ট্রীটেজেষ্ট্রী করবে। তোমার কাছে সেই সব পরামর্শের জন্যে এসেছিল।'

আমি বললাম, 'আরে না না। ওরা জানে আমার মত লেখকরা শুধু লিখে যায়। আর লিখে যায়। কোন পরামর্শ-টরামর্শের ধার ধারে না।'

আমি যে নতুন গল্পটা এবার শেষ করে এনেছি তার নায়িকার বুড়ো বাপ নেই, দিদিও নেই যাঁরা লেখকের বাড়ি বয়ে এসে সূক্ষ্ম শ্লেষ পরিহাস করে যান।

তারপর একদিন শুনলাম রেখার সেই সম্বন্ধ ভেঙে গেছে। কী কারণে জানিনে পাত্রপক্ষ পিছিয়ে গেছেন।

কিন্তু মাস তিনেক বাদে হঠাৎ এই বিয়ের নিমন্ত্রণের চিঠি। না নতুন কোন সম্বন্ধ নয়। সেই পুরোন ভেঙে যাওয়া সম্বন্ধই ফের জোড়া লেগেছে। রেখার কপাল ভালো।

বিয়ে বারাসতে হচ্ছেনা। শ্যামবাজার রেখার মামা বাড়ি।

সেখানেই বিবাহ বাসর। সন্ধ্যায় নিমন্ত্রণ। কিন্তু তখন আমার অফিসে সায়ংকৃত্য। আমার তখন যাবার সময় হবে না। তাই বিয়ের দিন বেলা প্রায় ছটোর সময় রেখাকে আশীর্বাদ করতে গেলাম। বাড়ি দেখেই চিনতে পারলাম। চুড়ার ওপর ময়ুর পাখার মত ছাদের উপর মেরাপ। কিছু ভীড়, কিছু গোলমাল, লোকজনের যাতায়াত। সিঁড়িতে দুপ দাপ শব্দ। তবে এখনো আলো জ্বলেনি, বাজনা বাজেনি। সন্ধ্যার এখনো অনেক দেরি। তার আগে বর আসবে না। রাজেনবাবু আমাকে দেখে হাসলেন। বিজয়ীর প্রসন্ন পরিতৃপ্ত হাসি।

'আপনি যে এখন এলেন?' অসময়ে আসবার কারণ তাঁকে জানালাম। তিনি বললেন, 'এসেছেন যে, এই আমাদের ভাগ্য। সুলেখা রেখার কাছে নিয়ে যাও ওঁকে। উনি আশীর্বাদ করবেন। বড় জামাই তো আসতেই পারল না। জানেন বোধ হয়। ছুটি পেলনা।'

সুলেখা আমাকে দোতলার একটি ছোট ঘরে নিয়ে গেল। রেখাকে ঘিরে আরও কয়েকটি মেয়ে বসে ছিল। তারা সঙ্গে সঙ্গে উঠে বেরিয়ে এল। সুলেখা বলল, 'আপনি ওর সঙ্গে কথা বলুন আমি আসছি। বউদি এলেন না?'

বোধ হয় খাবার টাবার কিছু আনতে গেল। কিংবা রেখাকে কয়েক মিনিট একা বসবার সুযোগ দিতে ইচ্ছে হল ওর।

আমি একটা চেয়ারে বসলাম। রেখা নিচু একটি মোড়ায়। ওর পিঠে ঘন কালো চুল এলিয়ে পড়েছে। পরণে লালপেড়ে সাদা গোছের শাড়ি। একটু আগে আভ্যুদয়িকের কাজ শেষ হয়েছে। কপালে ফোঁটা কব্জীতে লাল সুতোর মাঙ্গলিক। সব গয়না এখনো পরেনি। শুধু গলায় হার আর কানে ফুল পরেছে। এক সঙ্গে বাঁধানো তিনখণ্ড গল্প গুচ্ছের শোভন সংস্করণটি ওর হাতে তুলে দিয়ে হেসে বললাম, 'অনেক দিন তোমাদের বাড়িতে যেতে বলেছ।

কিছুতেই সময় করে উঠতে পারিনি। আজ কিন্তু ভালোদিনেই এসে পড়েছি।'

রেখা একটু হাসল, 'ভালোদিন বই কি।'

আমি বললাম, 'ভালোভাবে নেওয়াটাই তো ভালো।'

রেখা বলল, 'না নিয়ে যখন পারলাম না—।'

কিন্তু আজ আর ওসব কথা নয়। আপনাকে আর একদিন সব বলব।'

ভাবলাম এখন রেখাকে আর কিছু না বলাই ভালো। বলে আর লাভ কী।

বললাম, 'যাঁর সঙ্গে তোমার বিয়ে হচ্ছে তাঁকে তুমি দেখেছ?'

রেখা বলল, 'হ্যাঁ, তিনি তিনবার আমাকে এসে দেখে গেছেন। শেষবার অনেক কথা জিজ্ঞেস করেছেন, অনেক কথা আদায় করেছেন। আজ নয়, আপনাকে আর একদিন সব বলব।'

যে কাঁচা ভাষায় কাঁচা প্রেমের গল্প লিখত সেই কিশোরী মেয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়েছে। আমার সামনে এখন একটি পূর্ণ যৌবনা নারী। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ।

আমি হেসে বললাম, 'তোমার আর কিছু বলা দরকার নেই। বরং পারো তো লিখো।'

রেখার দুটি ঠোঁট অভিমানে চাপা কান্নায় ফুলে উঠল।

আমি আবার সেই ফ্রকপরা মেয়েটিকে দেখতে পেলাম। সেই অবুঝ, বড়ো অবুঝ মেয়েটি এই তরুণীর মধ্যে এতক্ষণ কোথায় লুকিয়েছিল?

দুটি সজল চোখ রেখা এবার আমার দিকে মেলে ধরল, 'না আমি আর লিখব না। আপনাকে সেই জন্যই খবর দিয়েছি। আপনার কাছে আমার যত গল্প আছে সব ছিঁড়ে ফেলবেন, নষ্ট করে ফেলবেন। আমি আর লিখব না।'

রেখা ওর দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজল। ওর কোন অঙ্গই এখন আর দেখা যায় না। শুধু কালো চুলের বন্যা।

সুলেখা এসে ঘরে ঢুকল। গা ভরা গয়না। মুখে পান। এক হাতে স্বচ্ছ কাচের গ্লাসে টল টল করছে জল আর এক হাতে খাবারের প্লেট।

সুলেখা বোনের দিকে তাকিয়ে ভ্রূ কুঁচকে একটু থমকে দাঁড়াল। তারপর বলল, রেখা, তুই ও ঘরে যা।'

রেখা উঠে চলে গেল।

আমার দিকে চেয়ে সুলেখা এবার হেসে বলল, 'খান। বিয়ে বাড়িতে এলে মিষ্টি খেতে হয়।'

বললাম, 'কিন্তু অত মিষ্টি কি এখন খেতে পারব?'

॥ উপনয়ন ॥

লিখতে বসেছিলাম।

সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে একটু বিরক্ত হয়েই উঠে গিয়ে দোর খুলে দিলাম।

আগন্তুক স্মিত মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। লম্বা কালো ছিপছিপে চেহারা। মাথায় কাঁচাপাকা চুল। নাকটি চোখা। চোখ ছুটিও বেশ তীক্ষ্ণ। পরণে একটা গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি।

সকাল বেলায় এই অপরিচিত ভদ্রলোককে দেখে আমি একটু ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কাকে চান?' তিনি হেসে বললেন, 'তোমাকেই চাইছি। চিনতে পারলে না বুঝি? আমি কুমারপুর কালীবাড়ির পুরোহিত যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্তী।'

আমি বললাম, 'ও আপনি! আস্থন, ভিতরে আস্থন।' চক্রবর্তী মশাই ভিতরে ঢুকলেন। এদিক ওদিক তাকিয়ে আমার পুরোণ ইজিচেয়ারটায় বসে হেসে বললেন, 'মনে হচ্ছে তুমি এখনো যেন আমাকে ভালো করে চিনতে পারোনি। বিশ্বাস হচ্ছে না নাকি?'

আমি আমার চেয়ারটা তাঁর দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বললাম, 'বিশ্বাস না হওয়ার কী আছে। আপনি মিছামিছি ছদ্ম পরিচয় দেবেন কেন? তবে আমি কালীবাড়িতে খুব কমই যেতাম। স্কুলে যাতায়াতের সময় পথে পড়ত অবশ্য। আর সেও তো কম দিন হল না। পঁচিশ ছাব্বিশ বছর হল কুমারপুর ছেড়েছি। এই সিকি শতাব্দীতে আমিও বদলেছি আপনিও বদলেছেন।'

তিনি বললেন, 'সিকি শতাব্দী! বাঃ কথাটা তো মন্দ বলোনি।

লেখক মানুষ জিহ্বাগ্রে সরস্বতী। বেশ বেশ। আমি এই পৃথিবীতে আছি অর্ধ শতাব্দীর ওপর হয়ে গেল। অনেক দেখেছি অনেক শুনেছি। পরিবর্তনের কথা বলছিলে। পরিবর্তন হয়েছে বইকি। গত দশ পনের বছরের মধ্যে একশ বছরের পরিবর্তন হয়ে গেল। সোনার বঙ্গ পূর্ববঙ্গ তার এখন কী চেহারা। দেখলে আর চেনা যায় না।'

এর পর দুজনেই খানিকক্ষণ চুপ করে রইলাম। বাল্যকৈশোরের যে ভূমি আমরা ছেড়ে এসেছি সেই পল্লীভূমি তার ফল জল শস্যক্ষেত নদীনালা নিয়ে ফের আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। আমি নিজের মনে সেই মানচিত্র দেখতে লাগলাম।

'বাবাজী বুঝি অনেকদিন দেশে যাও না?'

হঠাৎ আমার খেয়াল হল ভদ্রলোক আমার ঘরে একা চুপ চাপ বসে আছেন।

আমি একটু লজ্জিত হয়ে তাঁর দিকে তাকালাম। বললাম, 'না। বছর দশেক যাওয়া হয় না। পাসপোর্ট ভিসা চালু হওয়ার পর থেকে আর যেতে পারিনি। যাব যাব করেছি অনেকবার।'

চক্রবর্তী মশাই বললেন, 'তা তো বটেই। তোমাদের সময় কোথায় তোমরা তো সব সময় ব্যস্ত। আমি মাঝখানে একবার গিয়েছিলাম। কিন্তু না যাওয়াই ভালো। যাওয়া মানে কষ্ট পাওয়া, বুকের ভিতরটা জ্বলে যাওয়া। যেখানে মানুষজন গম গম করত সে সব জায়গা এখন শ্মশান। শিয়াল কুকুর চরে বেড়ায়। সেই সব ঝকঝকে তকতকে বাড়িঘর, মায়ের মন্দির সব জঙ্গলে ঢাকা পড়ে গেছে। তুমি যাওনি ভালো করেছ। বুদ্ধিমানের কাজ করেছ।'

অবশ্য এ বর্ণনা আজ আর নতুন নয়। তের বছর হয়ে গেল বাংলা দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। তারপর থেকে পূর্ববঙ্গের অনেকের মুখেই এসব কথা শুনেছি। অনেকের বুকই ক্ষোভ আর আফশোসে ফুলে উঠতে দেখেছি। তবু চক্রবর্তী মশায়ের দুঃখকে যেন নতুন করে

দেখলাম। তাঁর অসহায় অভিমানভরা কণ্ঠে যেন ফের অনেককণ্ঠের প্রতিধ্বনি শুনতে পেলাম।

আবেগকে আয়ত্বে আনবার জন্যে দুজনেই খানিকক্ষণ সময় নিলাম আমরা। একটু বাদে বললাম, 'চা খান আপনি।' তিনি বললেন, 'আহাহা, আবার চা কেন। তুমি লিখছিলে, তোমার সময় নষ্ট হচ্ছে। কিন্তু সব জেনে শুনেও তোমাকে ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করছে না। কতকাল পরে দেখা।'

আমি লজ্জিত হয়ে বললাম, 'না না উঠবেন কেন বসুন, বসুন।' তারপর চিত্তকে ডেকে বললাম, 'মোড়ের দোকানটা থেকে তুই কিছু খাবার নিয়ে আয়। তারপরে চা করিস।'

চক্রবর্তী মশাই খুসি হয়ে বললেন, 'এই দেখ, আবার খাবার কেন। এবার তুমি বড় বাড়াবাড়ি শুরু করলে বাবাজী। আমার সঙ্গে কি তোমার লোক লৌকিকতার সম্পর্ক, ভদ্রতার সম্পর্ক যে তুমি অত ব্যস্ত হচ্ছ? তোমার মনে নেই কিন্তু আমার বেশ মনে আছে। বই খাতা বগলে করে আমাদের কালীবাড়ির সমুখ দিয়েই বন্ধুদের সঙ্গে স্কুলে যেতে। মন্দিরে থাকতাম আমি আর আমার বাবা। তোমরা অন্য সময় বেশি আসতে না। কিন্তু পরীক্ষার সময় এসে মন্দিরের সিঁড়িতে প্রণাম করে যেতে। কখনো বাবা কখনো আমি তোমাদের আশীর্বাদী ফুল বেলপাতা দিতাম। আশীর্বাদ শিরোধার্য। কিন্তু মাথায় তো বেশিক্ষণ তা রাখা যায় না। তাই তোমরা সেই ফুল কানে গুঁজে রাখতে। স্কুলে পরীক্ষার তো আর শেষ ছিল না। সাপ্তাহিক পরীক্ষা, ত্রৈমাসিক পরীক্ষা, ষান্মাসিক পরীক্ষা, বার্ষিক পরীক্ষা। পরীক্ষা তোমাদের লেগেই ছিল। তাই প্রায়ই তোমাদের দেখা পেতাম।' চক্রবর্তী মশাই হাসলেন। তাঁর দাঁতগুলি পানের ছোপে কালো কালো। কিন্তু আমার চোখে তা তেমন বিষদৃশ লাগল না। তা ছাড়া তাঁর কৃষ্ণবর্ণ দাঁত তো আমি আর দেখছিলাম না তখন। আমার মন আমার দুটি চোখকে সঙ্গে

নিয়ে স্মৃতির রঙীন পাখায় ভর করে সেই কুমারপুরের কালীবাড়ির সামনে গিয়ে হাজির হয়েছে। যেখানে পঞ্চ প্রদীপে আলো জ্বলছে। বড় বড় পিতলের ছুটি ধুনুচি থেকে সুরভিত ধোঁয়া উঠছে। তালে তালে কাশি বাজছে। নামাবলী গায়ে পুরোহিত মশাই সে পাষাণী শ্যামার মুখের কাছে একবার ধূপ একবার দীপ একবার রক্তজবায় ভরা তামার পুষ্পপাত্র নিয়ে আরতি করে যাচ্ছেন। কোন কোন সময় কালীকে মনে হত ভয়ঙ্করী। আবার দীপের আলোয় ধূপের ধোঁয়ায় মনে হত জিভ বার করে তিনি হাসছেন। মনে হত জিভ বার করাটা তাঁর মুদ্রাদোষ। ওতে ভয়ের কিছু নেই। পুজোর সময় তিনি নিজেই যেন জিভটা মুখের মধ্যে ভরে নিতে পারলে বাঁচেন। আজ আমি পৌত্তলিক নই, নাস্তিক নই। ব্রহ্মকে যেমন নেতি নেতি করে বোঝাতে হয় আমার নিজেকেও তেমনি নেতি নেতি করে জানা ছাড়া উপায় নেই। আমি যে কী আজ বলা বড় কঠিন। কিন্তু সেদিন খুবই সহজ ছিল। সেদিন লজ্জাবতী কালীর জিব সম্বন্ধে আমি ছিলাম বিশেষজ্ঞ। শ্যামামূর্তির সামনে সেই নাটমন্দিরটিকেও আমি দেখতে পেলাম। টিনের বড় আটচালা। যাত্রা হত, কবি হত। গঞ্জের সব ছেলে বুড়ো ভেঙে পড়ত। মেয়েরা থাকতেন চিকের আড়ালে। বসবার আসন নিয়ে ছেলেদের কাড়াকাড়ি মারামারির অন্ত ছিলনা। এজন্যে বড়োদের ধমকও খেতে হত খুব। একবার এই কালীবাড়ির পুরোহিতই আমাকে বেশ ভালো জায়গায় বসিয়ে দিয়েছিলেন। সেই পুরোহিত কি ইনিই না ওঁর বাবা ভালো করে মনে পড়ছেনা। কিন্তু ধ্রুব পালা হচ্ছিল তখন বেশ মনে আছে। সুনীতি আর সুরুচি ছুই রাণীর ঝগড়ার কথা বেশ মনে আছে, রাজার বিশাল গোঁফ জোড়া আমার স্মৃতির পটে অম্লান হয়ে রয়েছে। চক্রবর্তী মশাই আমার ইজিচেয়ারে বসে রইলেন। কিন্তু আমি গিয়ে বসলাম সেই নাটমন্দিরের যাত্রার আসরে সেই ধুলোয় ভরা ছেঁড়া শতরঞ্চির ওপর, আমি সেই পরম কৃষ্ণভক্ত বালক ধ্রুবকে দেখতে

লাগলাম। ধ্রুব কি একজন? যে যাত্রার আসরে রাজপুত্রের বেশে সেজে এসেছে বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলছে আর যে বালক দর্শকের আসনে তন্ময় হয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে তারা কি আলাদা? আমি তিরিশ বছরের দূরত্ব থেকে দুই ধ্রুবকেই চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম।

চিত্ত চা আর খাবার নিয়ে এল।

চক্রবর্তী মশাই বললেন, 'দেখো দেখো, কাণ্ড দেখো, এই সকাল বেলায় একরাশ খাবার না আনলে আর তোমার চলল না। সেই বয়স কি আর আছে? এখন আর তেমন খেতে পারিনে।'

ভদ্রলোক দুটি সিঙ্গাড়া, দুখানা কচুরী, দুটি রসগোল্লা শেষ করে চায়ের কাপে চুমুক দিলেন। আমি ভাবলাম আরো বেশি করে কিছু খাবার আনলেই হত।

খেতে খেতে চক্রবর্তীমশাই দেয়ালের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠলেন, 'আরে তোমার বাবা না?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ, বাবার একখানা ফটোগ্রাফ এনলার্জ করে—।'

কিন্তু চক্রবর্তী মশাই ততক্ষণে প্রতিকৃতি বাদ দিয়ে একেবারে আসল মানুষটির কাছে চলে গেছেন।

তিনি বলতে লাগলেন, 'আহা অমন মানুষ আর হয় না। আমরা ওঁকে দাদা বলে ডাকতাম। খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করতাম। দেব দ্বিজে তাঁরও অসাধারণ ভক্তি ছিল। কত রকম যে গুণ ছিল আর মানুষের কত রকমের যে উপকার করেছেন তা বলে শেষ করা যায় না।'

আমি আর একজনের মুখে আমার বাবার কীর্তির কথা, খ্যাতির কথা, শুনতে লাগলাম। তিনি অনেককাল হল আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। ফটোখানা বাঁধিয়ে রেখেছি সেও কম দিন হল না। কিন্তু রোজতো আর ফটোখানায় চোখ পড়ে না, রোজতো আর তাঁর কথা মনে পড়ে না, চক্রবর্তী মশাইর মুখে তিনি যেন নতুন করে জীবন্ত হয়ে উঠলেন। তারপর চক্রবর্তী মশাই আমার পরিবার পরিজনের কথা

জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। কবে বিয়ে করেছি, কটি ছেলে মেয়ে, কে কী পড়ে সব খুটে খুটে জেনে নিলেন। ছেলেদের কথা জিজ্ঞেস করতে হঠাৎ চক্রবর্তী মশাই বলে বসলেন, 'তোমার কাছে একটি সাহায্য চাইতে এসেছি বাবাজী। তোমার কাছে তো আমার কোন সংকোচ নেই। ভিক্ষেই বলো সাহায্যই বলো তোমার কাছে আমি সবই চাইতে পারি।'

আমি বললাম, 'ছি ছি ওসব কী বলছেন, কী দরকার আপনার বলুন।'

তিনি বললেন, 'দুটি ছেলের উপনয়ন দেব বাবা। শেষ বয়সে দুটি বাঁদর জন্মেছে। কিন্তু বাঁদরই হোক আর যাইহোক, বামুনের ছেলে গলায় সুতো দিতেই হবে। তোমাদের সাহায্য ছাড়া আমি পৈতার খরচ কি জোগাতে পারব। আমার বাবাকে হাত পাততে হয়নি। যজমানরা, শিষ্যরা নিজেরা যেচে গিয়ে যেচে দিয়ে এসেছে। কিন্তু আমার তো আর সে সব নেই। সবই তো ছেড়ে এসেছি। এখানে তোমরা ছাড়া আমাকে কেই বা চেনে? কার কাছেই বা আমি মুখ ফুটে চাইতে পারি। উত্তরপাড়ায় এক কলোনীর মধ্যে থাকি। যজমানিতে বিশেষ কিছু আর হয় না। আজকাল তো আর মানুষের বিশ্বাস টিশ্বাস কিছু নেই। শুধু ধর্মকর্মের উপর নির্ভর করে আজকাল বেঁচে থাকাটাই শক্ত হয়েছে বাবাজী। সে দিন আর নেই। তবুতো ক্রিয়াকর্ম একেবারে ছাড়লে চলে না।'

আমি বললাম, 'কত দিতে হবে?'

চক্রবর্তী মশাই পরম লজ্জিত হয়ে বললেন, 'তাকি আমি বলতে পারি? তোমার যা সাধ্য—সাধ্য তোমার অনেক তা আমি জানি। কিন্তু তুমিও তো গৃহস্থ মানুষ খরচ খরচা অনেক। যার যেমন আয় তার তেমন ব্যয়। তুমি যা খুসি হয়ে দেবে তাই আমার ঢের।'

আমি ইতস্তত করতে লাগলাম। এক সঙ্গে দুটি ছেলের পৈতে। কত দিই। কত দিলে ভালো হয়।

চক্রবর্তী মশাই বলতে লাগলেন তিনি আরো অনেকের কাছে গিয়েছিলেন। বালী থেকে বেলেঘাটায় আর টালিগঞ্জ থেকে এই টালায় কুমারপুরের লোক তো আর কম নেই। তবে সবাইর কাছে যাওয়া যায় না, যাদের অন্তর আছে, দেবদ্বিজে ভক্তি বিশ্বাস আছে তাদের কাছেই যেতে হয়। তারা কেউ তাঁকে বিমুখ করেনি। যে পাঁচ পেরেছে পাঁচ দিয়েছে, যে দশ পেরেছে দশ। কেউ বা নতুন কাপড় চোপড়ও দিয়েছে। চক্রবর্তী মশাইর কোন দাবি নেই। আমি যা দেব তিনি তাই খুসি হয়ে নেবেন।

মাসের শেষ। তবু দশটাকার নোটখানা হাতে তুলে দিলাম চক্রবর্তী মশাইর।; নিজের হাত খরচ বাবদ লুকিয়ে রেখেছিলাম।

তিনি খুসি হয়ে উঠে চলে গেলেন বললেন, 'অনেক উপকার করলে বাবাজী। বেঁচে থাকো।'

এর মাস দুই পরে বেলেঘাটায় গিয়েছি এক সংস্কৃতিচক্রের চক্রান্তে পড়ে। ক্লাবের বার্ষিক অধিবেশনে আমাকে আতিথ্য স্বীকার করতে হয়েছে। সেখানে দেখা হল সুনীল দত্তের সঙ্গে। সুনীল আর আমি সহপাঠী ছিলাম। একই সঙ্গে মাষ্টারমশাইদের বেত খেয়েছি, বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়েছি, আবার সব লজ্জা সব দুঃখ ভুলে গিয়ে কালী বাড়ির যাত্রার আসরে এসেও বসেছি। সুনীল বাড়িটাড়ি করেছে। কৃতী মানুষ। কথায় কথায় তার কাছে চক্রবর্তী মশাইর কথা বললাম।

শুনেই সুনীল লাফিয়ে উঠল, 'আরে ও তো একটা চীট। তোমার কত গেছে?' আমি বললাম, 'কত গেছে মানে? আমি তাঁকে দশটাকা দিয়েছি। দুই ছেলের পৈতে—।'

সুনীল হেসে বলল, 'ও হিসেব করে মাথা পিছু পাঁচ টাকা দিয়েছ বুঝি? আমার ভাই আড়াই প্লাস আড়াই—মোট পাঁচের ওপর দিয়েই গেছে। তুমি একেবারে দাতাকর্ণ হয়ে বসেছিলে?' আমি

বললাম, 'চৌট যে কি করে জানলে ?' সুনীল বলল, 'ভুরিভুরি প্রমাণ আছে, ভুরি ভুরি। ওর আগের পক্ষের ছেলে মেয়ে ছিল। তাদের সব ফেলে চলে এসেছে। কোন্ এক তরুণী বিধবাকে সধবা করে তাকে সঙ্গে নিয়ে আছে। তার শাঁখা সিঁদুর শাড়ি গয়নার খরচ জোগাবার জন্মেই ও আজকাল এই সব করে বেড়ায়। আজ ছেলের পৈতে, কাল মেয়ের বিয়ে, পরশু নাতির অন্নপ্রাশন। তুমি তৈরী হয়ে থাকো। বিশ্বাস হচ্ছেনা ? আমি একেবারে প্রত্যক্ষদর্শীদের এনে তোমার সামনে হাজির করে দেব। যারা ঠকেছে তারা তো আর মিথ্যে কথা বলবেনা ? আনব নাকি সাক্ষী সাবুদ ?'

আমি বললাম, 'না ভাই, তার আর দরকার নেই।'

সেদিন সংস্কৃতির তাৎপর্যের ওপর ভাষণ আমার কিছুতেই জমলনা। আমি এমনিতেই ভালো বলতে পারিনে আজ একেবারে তোৎলাতে শুরু করলাম। কেবলি মনে হতে লাগল ঈস্ এমন করে আমাকে ঠকিয়ে নিল আমি একেবারে বোকা বনে গেলাম। দশটাকা তো নয় যেন যথাসর্বস্ব গেছে।

আরো কিছুদিন বাদে আমি যখন শোকমুক্ত হলাম এই ঘটনাকে —এই দুর্ঘটনাকে আমি একটু অন্য চোখে দেখতে পারলাম। মনে হল আমি একেবারে ঠকিনি। সেই ধূপের ধোঁয়া, দীপের আলো, ফুল চন্দনের গন্ধ, ঘণ্টার ধ্বনি সেই যাত্রার আসরে দুটি ধ্রুব, সেই রূপের জগৎ, বিশ্বাসের জগৎ, মাধুর্যের জগৎ—চক্রবর্তী মশাইর সঙ্গে সঙ্গে যারা ফিরে এসেছিল তারা তাঁর দুই ছেলের উপনয়নের মত অলীক নয়।

আমার মনে হল কে জানে চক্রবর্তী মশাইও হয়তো ষোল আনা প্রবঞ্চক নন, হয়তো তিনিও আঠের আনাই বঞ্চিত।

॥ সেই মুখ ॥

বরযাত্রী বোঝাই বড় নৌকাখানা আসছে পিছনে। সে নৌকায় আত্মীয়, কুটুম্ব, কুটুম্বের কুটুম্ব সব আছেন। কয়েক জন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে পূর্ণেন্দু রয়েছে মাঝারি ধরণের একখানা নৌকায়। পূর্ণেন্দুর বাবা সুরেনবাবু বিশেষ করে এই বন্দোবস্ত করেছেন। তিনি জানেন তার রুচি, জানেন প্রকৃতি। বেশী ভিড় পূর্ণেন্দু সহ্য করতে পারবে না। তার জন্য নিরিবিলি একটু কোণ চাই।

খালে নদীতে ঘণ্টা চারেকের পথ। বন্ধুরা চারজন মুখোমুখি হয়ে তাস খেলতে বসেছে। পাকড়াও করে এনেছে পূর্ণেন্দুকেও, কিন্তু খেলায় পূর্ণেন্দুর মন নেই॥ বার কয়েক সঙ্গীর ধমক খেয়ে পূর্ণেন্দু হাল ছেড়ে দিল বন্ধু বিজয়কে।

'ব্যাপার কি, অভিমান নাকি।'

পূর্ণেন্দু ক্লান্তকণ্ঠে বলল, 'না, খেলতে ভালো লাগছে না।'

সুজিত বলল, 'সেকি, সবে তো খেলা সুরু হোতে যাচ্ছে।'

সঞ্জীব সিগারেট ধরাতে ধরাতে আড় চোখে তাকিয়ে হাসল, চিরকালই কি আর লোকের খেলতে ভালো লাগে। অন্ততঃ একখেলা ভালো লাগে না। পূর্ণেন্দুর এখন খেলনা হবার সাধ হয়েছে।

হেমন্ত বলল, 'সাধটা কিন্তু ভালো নয়। একবার মাধবীর হাতের মুঠোর ভিতর ঢুকলে বেরোবার কিন্তু আর সাধ্যি থাকবে না।'

সঞ্জীব আর একবার বাঁকা চোখে তাকাল, 'নাই বা রইল। পূর্ণেন্দুর মত মানুষের কারো মুঠোর ভিতর ঢুকে যাওয়াই ভালো। কী বল হে, তাই সব চেয়ে নিরাপদ। বারবার স্থানে অস্থানে প্রবেশ প্রস্থানের চেয়ে—'

পূর্ণেন্দুর মনে হোল সঞ্জীবকে সঙ্গে আনাই ঠিক হয়নি। এক দুর্বলক্ষণে ওর কাছে নিজের বোকামির কথা স্বীকার করেও পূর্ণেন্দু ভুল করেছিল। ও হয়তো হাসতে হাসতে আরো দু'চার জনকে সে কথা বলতে পারে। ওর অসাধ্য কাজ নেই। কনে পক্ষের কাউকে কাউকেও সঞ্জীব চেনে। যদি তাদেরও বলে দেয় লজ্জার আর সীমা থাকবে না। ছি ছি ছি সঞ্জীব সব পারে। কত মেয়ের বিয়ে ভেস্তে দিয়েছে। কত জনের দাম্পত্য-জীবনে ফাটল ধরিয়েছে। সঞ্জীব সেনের মত ভিলেইন টাইপের মানুষকে সঙ্গে আনাই ঠিক হয়নি পূর্ণেন্দুর। কিন্তু ও নিজে এসে জায়গা জুড়ে বসেছে। কেউ তো ওকে আদর করে ডেকে আনে নি।

কিসের একটা অস্বস্তি আর আশঙ্কায় পূর্ণেন্দুর মন ভরে উঠল। যদিও এ আশঙ্কার কোন মানে হয়না। সঞ্জীব আজ আর তার কি ক্ষতি করবে। ব্ল্যাক মেইল করতে গেলে ও নিজেই মার খাবে।

কিন্তু সমস্ত যুক্তি তর্কের বাইরে পূর্ণেন্দুর মনে একটি দুঃস্বপ্নের স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

বন্ধুর দল আবার তাসে মন দিল। কিন্তু পূর্ণেন্দু যেমন মন মরা হয়েছিল তেমনি ভাবেই তীরের গাছপালার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

পূর্ণেন্দুর পরণে শুভ্র মিহি খদ্দর। অনেক সাধ্য সাধনা করেও অন্তত আজকের জন্যও খদ্দর ছাড়া কিছু তাকে পরানো যায় নি। কপালে মায়ের হাতের শ্বেত চন্দনের ফোঁটা। ছোট বোন নীলা সরু একটি বেল ফুলের মালা পরিয়ে দিয়েছে গলায়। কিছুতেই কোন আপত্তি শোনে নি। বরবেশ মাত্র এইটুকু। মোটেই বেশি কিছু নয়। এতটুকু বাহুল্য নেই, প্রাচুর্য নেই, কিন্তু সর্বত্র রুচির পরিচয় আছে শান্ত শোভন শুচিতা মিশে রয়েছে সব কিছুতে। কিন্তু শুচিতা নেই পূর্ণেন্দুর মনে। সেখানে যত ক্লেদ, যত গ্লানি এসে যেন পুঞ্জীভূত

হয়েছে। এমন দিনে সে কথা মনে পড়বার নয়, তবু মনে পড়ছে। শত চেষ্টা সত্বেও কিছুতেই অন্যমনস্ক হ'তে পারছে না পূর্ণেন্দু।

লাল সিমেণ্টের সিঁড়ি বাঁধানো ঘাটে নৌকা এসে ভিড়ল। সামনে পশ্চিমের দিগন্তে সূর্য অস্ত গেছে, কিন্তু রঙের আস্তরণ এখনো মুছে যায় নি।

বন্ধুরা বলল, 'নাগরিকার সঙ্গে কোন্ লগ্নে শুভদৃষ্টি হবে জানিনা। নগরীর সঙ্গে তো গোধূলি লগ্নেই হল।'

নদীর পার ঘেঁষা মহকুমা সহর। আয়তনে ছোটই। কিন্তু বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। পায়ে হাঁটা পথ গেছে এদিকে ওদিকে। দুদিকে ঘন শ্যাম দুর্বা, মাঝখানের পথটুকু কুমারীর সিঁথির মত সাদা আর সরু। আরো একটু ভিতরের দিকে গিয়ে দেখা গেল রঙ বদলেছে। নরম লাল সুরকির রাস্তা বেরিয়েছে কয়েকটি। এপাশে ওপাশে দেবদারুর সার। ঝাউ আছে মাঝে মাঝে আর আছে রক্ত-রাঙা কৃষ্ণচূড়া। ফুলে ফুলে ডাল যেন ভেঙে পড়েছে, পাতা দেখা যায় না। কোন কোন রাস্তায় কিছু কিছু সুপারি নারিকেলের গাছও চোখে পড়ল। ফিকে লাল রঙের ছোট ছোট সুপারির থোবা। নারিকেল গাছে কচি কচি ডাব। বাড়ি ঘর করোগেট টিনেরই বেশি। ফাঁকে ফাঁকে দু'একটি নতুন কোঠাবাড়িও দেখা গেল। সুজিত উল্লসিত হয়ে বলল, 'চমৎকার সহর, পথ যার এত সুন্দর, ঘর না যেন তার কি।

সত্যিই চমৎকার পথ, কিন্তু এই পথের পাশাপাশি আরও একটি সংকীর্ণ গলি পথ পূর্ণেন্দুর মনশ্চক্ষে ভেসে উঠছে। সে গলি রাজ-ধানীর। সেই পিচ্ছিল অপরিচ্ছন্ন পথের সঙ্গে এই লাল সুরকি ঢালা পথের কোন মিল নেই। তবু সেই পথের কথা পূর্ণেন্দু ভুলতে পারছে না। তার অশুচিতা আর দুর্গন্ধ যেন সমস্ত বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে।

স্বজন-বন্ধুদের সঙ্গে একতলা একটি সাদা বাড়িতে ঢুকতে হোল

পূর্ণেন্দুকে। প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে নানা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের সুরু হোল। বধূদের কলকণ্ঠে ভিতর থেকে উলুধ্বনি শোনা গেল। কুমারীরা করল শঙ্খধ্বনি। সঙ্গে সঙ্গে ঢুলীরা কাঠি দিল ঢোলে। সানাই বাজতে সুরু করল।

উল্লাসে আনন্দে প্রত্যেকটি মেয়েকেই সুরূপা মনে হচ্ছে। বিশেষ করে সেজেছে তারা এই দিনটির জন্য। একদল মেয়েতো নয় এক স্তবক ফুল।

কিন্তু আশ্চর্য, পূর্ণেন্দুর এখনো সেদিনের কথা মনে পড়ছে। সেদিনও পূর্ণেন্দুর এক স্তবক ফুলই মনে হয়েছিল।

বাইরের বড় ঘরটিতে বর আর বরযাত্রীদের বসবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পূর্ণেন্দুর জন্য কার্পেটে বোনা পুষ্পাসন। পাশে শুভ্র ঝালরের নাতিস্থূল তাকিয়া। ছোট একটি মেয়ে এসে গলায় মোটা করে গাঁথা গোঁড়ের মালা পরিয়ে দিল। বন্ধুরা ফিস্ ফিস্ ক'রে বলল, 'এ-টি বোধ হয় সব চেয়ে ছোট। যা হোক নমুনাটি দেখে কিন্তু বেশ আশা হচ্ছে।'

সুরেনবাবু এ-বাড়িতে কেবল বরকর্তা নন শুধু, তাঁর ভবিষ্যৎ কুটুম্ব, উমার বাবা বনবিহারীবাবুর সঙ্গে অতীতের সহপাঠিত্ব তিনি আবিষ্কার করেছেন। স্কুল কলেজে অনেক ছেলের সঙ্গেই বনবিহারী পড়েছেন। তাদের কারো কারো সঙ্গে যখন হঠাৎ একেক সময় দেখা হয়ে যায় নাম আর মুখ একসঙ্গে তিনি মনে করতে পারেন না। কারো বা মুখ মনে আছে কারো বা শুধু নাম। একটু বৈশিষ্ট্য আছে বলেই হয়তো সুরেনের নামটা বনবিহারীর মনে ছিল। সম্বন্ধের সূত্রপাতে সেই স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত হোল। ফলে সুরেনের দিক থেকেও দাক্ষিণ্য সৌজন্য আর শিষ্টাচারের অন্ত রইল না। তাতে নিশ্বাস ছেড়ে বেঁচেছেন বনবিহারী। ছাত্র বয়সে রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে যতটুকু নাম তাঁর হয়েছিল পরবর্তী পেশায় সেই খ্যাতি কিছুটা সহায়ক হলেও ওকালতিতে অর্থাগম বনবিহারীর তেমন হয়নি। কিন্তু

মনের মধ্যে সবল একটা আদর্শবাদ আছে বলেই দারিদ্র্য তাঁকে একেবারে দুঃস্থ ক'রে তোলে নি। সহনশীলতার শালীন রুচি-বুদ্ধিতে দিন-যাত্রায় সচ্ছলতা না হোক মোটামুটি একটি শোভনতার ছাপ তিনি আনতে পেরেছেন। তাঁর সঙ্গে অন্তরের মিল হয়েছে সুরেনের। মিলে গেছে স্বভাব-প্রকৃতিতে তাই বরকর্তা হয়েও কন্যা-পক্ষের অন্দরে, ভাঁড়ারে, রান্নাঘরে সর্বত্রই তিনি দেখে শুনে সাহায্য করে বেড়াচ্ছেন। বরং বরযাত্রীর দলেই দলপতির খোঁজ মিলছে না।

আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যে এই ধরণের অস্ফুট আলাপ আলোচনা পূর্ণেন্দুর কানে যাচ্ছিল কিন্তু কোন কিছুতেই ঠিক তেমন করে সে মন দিতে পারছিল না। বরং এই কথাই বারবার তার মনে হচ্ছিল, এমন সুন্দর শুভ অনুষ্ঠানের সেই যোগ্য নয়। ক্লেদাক্ত, কুশ্রীতায় তার মন বড়ই আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

এ যে শুচিতা নয়, শুচি বায়ুতা তা পূর্ণেন্দু জানে। এই বায়ুরোগে কোন কল্যাণ নেই। সেই স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলে পূর্ণেন্দুকে সুস্থ, সবল, স্বাভাবিক হয়ে উঠতে হবে। কিন্তু হয়ে উঠতে চাইলেই তো সব সময় হয়ে ওঠা যায় না। এ-যে একটা মানসিক ব্যাধি বিশেষ তা পূর্ণেন্দু চিনেছে কিন্তু রোগ চেনা আর সুচিকিৎসায় তাকে নিরাময় করা এক বস্তু নয়। সমস্ত শুভ চিহ্ন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ছাপিয়ে সেই শ্রীহীন রুচিহীন মুখ বৃহত্তর হয়ে পূর্ণেন্দুর চোখের সামনে ভেসে উঠছে। সেই গলির, সেই বাড়ির দুর্গন্ধ এখনও যেন পীড়িত ক'রে তুলছে তার ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে। সেই মুখের কুশ্রী মুখর ভাষণ, বিদ্রূপের বক্রহাস্য এখনো যেন কান থেকে পূর্ণেন্দুর মিলাতে চাচ্ছে না।

কিন্তু মুখ নয়, পূর্ণেন্দু প্রথম দেখেছিল কবরী। বিপুল, রহস্য-ঘন সেই কবরীভার। তার তলায় মুখ লুকাতে ইচ্ছা করে। ঢেকে রাখতে ইচ্ছা করে সমস্ত পৃথিবী আর সমস্ত জীবনকে। ঢাকা পড়বার অদম্য প্রেরণাতেই যেন পূর্ণেন্দু নিঃশব্দ পায়ে দূরে দূরে তার অনুসরণ

করে চলেছিল। সে তখনও মুখ ফিরায়নি। কিন্তু তার চলবার ভঙ্গি দেখেই পূর্ণেন্দু বুঝতে পেরেছিল সে টের পেয়েছে। তার অনুভূতিতে ধরা পড়েছে পূর্ণেন্দুর অস্তিত্ব।

খানিক আগে সামান্য একটু বৃষ্টি হয়ে গেছে। পায়ের তলার পথ ঈষৎ পিচ্ছিল আর কর্দমাক্ত, মাথার ওপরকার খণ্ডিত জ্যামিতিক আকাশে পাতলা মেঘের ফাঁকে জ্যোৎস্নার ম্লান আভাস আছে, চাঁদ নেই। পূর্ণেন্দুর মনে হয়েছিল সেই চাঁদ রয়েছে সামনে, তার দিকে পিঠ ফিরিয়ে। সে পিঠে অমাবস্যার পটভূমি। তার সুঠাম তনু দেহ জড়িয়ে জড়িয়ে উঠেছে ঘনকালো রঙের শাড়ি। সে তো রঙ নয়, কেবল রহস্য। মাঝে মাঝে ম্লান গ্যাসের আলোয় চিক্ চিক্ করে উঠছে দুই কানের দুটি ঝুমকো। দুলে উঠছে তার চলার ছন্দে ছন্দে। আর দুলছে পূর্ণেন্দুর হৃদপিণ্ড। দু'দিকে ঘনবদ্ধ বাড়ির সার। সমস্ত পৃথিবীর কৌতূহলী চোখ থেকে যেন তারা আড়াল রচনা করেছে পূর্ণেন্দুর জন্যে। মাঝে মাঝে অপেক্ষাকৃত দু'একটি প্রশস্ত রাজপথ পড়েছে পায়ের নিচে। জানলার নীল পর্দার আড়ালে আলো দেখা যাচ্ছে দু'একটি বাড়ির। তারপর আবার সেই গলি আর অন্ধকার। আর সামনে সেই রাত্রির রহস্য। তার এক-দিকে অন্ধকার পটভূমি। পূর্ণেন্দু চলছে তো চলছেই।

লগ্ন এগিয়ে এসেছে। বিয়ের আয়োজন চলেছে এখানে। ঘড়িতে সময় দেখা হোল। আর একবার উল্টানো হোল পঞ্জিকার পাতা। হ্যাঁ, এই ঠিক যোগ্য সময়। পুরোহিত বললেন, 'এবার আরম্ভ করা হোক।' শাঁখ উলুধ্বনি আর ঢোলের শব্দে চমকে উঠল পূর্ণেন্দু।

সঞ্জীব পিছন থেকে রসিকতা করে বলল, 'ব্যাপার কি, মুখ দেখে মনে হয় তোমাকে যেন বলি দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।'

সুজিত হেসে বলল, 'বলি ছাড়া কি। তবে কালীকরালিনীর কাছে নয়, রূপ লক্ষ্মীর দুই বাহুযুগে।'

সুরেনবাবুর নির্দেশ মত বিবাহ মণ্ডপের আসনে গিয়ে বসল

পূর্ণেন্দু। বনবিহারীবাবুর গম্ভীর মুখে প্রসন্ন স্মিত হাস্যের আভাস দেখা যাচ্ছে। একটু দূরে জড়ো হয়ে কৌতুকে আর কৌতূহলে অপেক্ষা করছে বন্ধুরা। আকাশে চতুর্দ্দশীর চাঁদ। ছোট উঠানটুকু দুটি হ্যাজাকের তীব্র আলোয় জ্বল জ্বল করছে।

কিন্তু পূর্ণেন্দুর মনের গলির মধ্যে জমাট অন্ধকার। রাজধানীর সর্পিল ছায়াঘন গলিপথে সেই কবরীভার-পীড়িতা তখনো পীড়ন করছে হৃদয়, পূর্ণেন্দুর সমস্ত অস্তিত্ব, সে রাণী, বিপুল সাম্রাজ্যের মহীয়সী সাম্রাজ্ঞী। তার অনুশাসন এড়াবার জো নেই পূর্ণেন্দুর। তাকে অনুসরণ করতেই হবে।

পুরোহিত বললেন, 'আমার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র পড়ুন।'

পূর্ণেন্দু ঘাড় নাড়ল।

মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকে অনুসরণ করে চলেছে পূর্ণেন্দু। সে-মন্ত্র উচ্চার্য নয়, অনুভব্য। শিরায় শিরায় তার ঝঙ্কার; তার ছন্দ রক্ত স্রোতের প্রবাহের মধ্যে।

পুরোহিত বললেন, 'কনেকে নিয়ে আসুন এবার।'

রক্তচেলী পরা বধূবেশিনী উমাকে মণ্ডপে নিয়ে আসা হোল। দীর্ঘাঙ্গী, তন্বী, সুন্দরী মেয়ে। বরযাত্রীর দল চকিত হয়ে তার দিকে তাকাল। কিন্তু পূর্ণেন্দু মাথা গুঁজেই রইল। কারো মুখের দিকে তার তাকাবার সাধ্য নেই, তাকাবার সাহস নেই তার।

তাকাতে চাইলেই যে তাকানো যায় না, তাকিয়ে থাকা যায় না সে অভিজ্ঞতা তার একবার হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে পথ চলতে চলতে তার অগ্রবর্তিনীও যে এক আধবার পিছনের দিকে না তাকিয়েছিল তা নয়, কিন্তু ভয়ে আর সঙ্কোচে পূর্ণেন্দু প্রতিবারই চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। কিংবা চোখ মেলে তাকালেই কি সত্যি সত্যি তখন সে কিছু দেখতে পেত? কারো মুখ তার চোখে পড়ত না সে চাক্ষুষ করত নিজের মোহকে, নিজের মোহময়ীকে।

তারপর গলির ভিতরের দিকে একটা জীর্ণ পুরোন বাড়ির সামনে এসে সেই মোহময়ী থামল। থামল পূর্ণেন্দু। আজকের এই বিয়ে বাড়ির মতই আরো একদল মেয়ে পূর্ণেন্দুকে অভিনন্দন আর অভ্যর্থনা জানাবার জন্যই যেন দাঁড়িয়েছে দ্বারদেশে।

পূর্ণেন্দু থেমে যেতেই তারা সরে দাঁড়িয়ে পথ করে দিল। আর সেই সঙ্গে ফিরে দাঁড়াল মোহময়ী, 'আসুন।'

পুরোহিত বললেন, 'এবার বরকনের মালাবদল আর শুভদৃষ্টি। বরের বন্ধুরা কেউ আসুন না এদিকে। সাহায্য করুন ওঁকে।'

সঞ্জীবের দলের জন দুয়েক এগিয়ে এল, পূর্ণেন্দুর কাণে কাণে প্রায় ফিস্ ফিস্ ক'রে বলল, 'আর কতদূর পর্যন্ত আমাদের সাহায্য করতে দেবে পূর্ণেন্দু?'

'তাকাও, চেয়ে দেখ, দেখতে হয়।'

দুই পক্ষ থেকে সস্নেহ উপদেশ আসতে লাগল। উমা একবার সলজ্জ দৃষ্টিতে পূর্ণেন্দুর দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিল। পূর্ণেন্দু দেখল কি দেখল না, কিন্তু সর্বাঙ্গ তার শির শির করে উঠল। মুহূর্তের জন্য মনে হোল পূর্ণেন্দুর এ ঠিক সেই মুখ, সেই রাত্রির মোহময়ীর মোহই বটে।

সমস্ত মুগ্ধতা সমস্ত মাধুর্য যেন পৃথিবী থেকে মুছে নিঃশেষ হয়ে গেছে। তবু সেই মুখের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিতে পারছে না পূর্ণেন্দু। পাউডারের ঘন প্রলেপেও কুশ্রী মেচেতার দাগ মিলায় নি; সুর্মায় ঢাকা পড়ে নি কোটরগত দু'চোখের ক্লান্তি আর অবসাদ কিন্তু তারই ভিতর থেকে যেন চিক চিক করে উঠছে আশাপূর্তির আনন্দ, আর ধূর্ত লোভ। ঈষৎ খয়েরী রঙের শুকনো ঠোঁট দুটিকে দেখাচ্ছে জোঁকের মত। তবু সেই মুখের ওপর পূর্ণেন্দুর পক্ষাঘাতগ্রস্থ অনড় অবশ দৃষ্টি স্থির হয়ে রয়েছে। পূর্ণেন্দুর সাধ্য নেই চোখ ফিরিয়ে নেওয়ার। 'দেখছেন কি, ভিতরে আসুন। পথের মধ্যে অমন করে সঙের মত দাঁড়িয়ে থাকলেই হবে না কি।'

মালা বদল আর দৃষ্টি-বিনিময়ের পর বাসর-ঘরে ডাক পড়ল পূর্ণেন্দুর। মেয়েরা সবাই মিলে একটু আমোদ ফুর্তি, হাসি ঠাট্টা করবে। সবাই তার জন্য অপেক্ষা করছে।

সঞ্জীব বলল, 'তবে যাও প্রতাপ এবার ওই প্রমীলা রাজ্যে গিয়ে প্রবেশ কর। তখন থেকে তুমি বর আর আমরা শুধু যাত্রী মাঝখানে ওই সীমন্তিনীদের সীমাহীন সাম্রাজ্য।'

রাত প্রায় দুটো পর্যন্ত চলল সাম্রাজ্ঞীদের সংগীতালাপ, হাস্য-কৌতুক, রসচর্চা।

পূর্ণেন্দুকেও অনুরোধ করা হোল গান গাওয়ার জন্য।

পূর্ণেন্দু মৃদুকণ্ঠে বলল, 'আমি গাইতে জানি না।'

'কিন্তু কথা বলতে তো জানেন। কথাই বলুন না হয় মন খুলে।'

উমার বন্ধু কুন্তলা তার বউদির কথার প্রতিবাদ করল, 'পূর্ণেন্দুবাবু কথা বলতেও যে জানেন কে বলল তোমাকে?'

'ওমা, তুমি কি তবে ওকে বোবা ভেবেছ নাকি? এতখানি বয়স হোল মাতৃভাষায় কথা বলতে শেখেন নি।'

কুন্তলা বলল, 'হয়তো শিখেছিলেন। কিন্তু এখানে এসে সব বেমালুম ভুলে বসে আছেন। ভালোই করেছেন। সব দেশেই কি আর মাতৃভাষা চলে। বিদেশে আর দেশ বিশেষে অন্য ভাষার দরকার হয়।

বউদি বললেন 'সে কি ইংরেজি ভাষা?'

কুন্তলা মাথা নেড়ে বলল, 'উঁহু সে ভাষা ইংরেজের নয়, সে ভাষা প্রিয়ার ভাষা। উমা, আজ রাত্রে ওঁকে সেই ভাষায় একটু হাতে খড়ি দিয়ে রাখিস তারপর কাল এসে আমরা ভালো ক'রে আলাপ করব। ভয় পাবেন না পূর্ণেন্দুবাবু। নতুন হলেও সে এমন কিছু কঠিন ভাষা নয়, প্রথম প্রথম ইসারা আভাসেও চলবে।'

তারপর দলবল নিয়ে কুন্তলা বেরিয়ে এল ঘর থেকে। এবার নির্জন ঘরে মুখোমুখি হতে হবে ওর সঙ্গে।

শিরায় উপশিরায় শিরশির করে উঠল পূর্ণেন্দুর, আবার সেই মুখ।

উমা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। ঘরের এক কোণায় জ্বলছে মাঙ্গলিক বিয়ের দীপ। জানালা দিয়ে চাঁদের আলো গলে পড়েছে ঘরের মধ্যে। কুন্তলা বকুল ফুলের মালা জড়িয়ে দিয়েছিল খোঁপায়। তার গন্ধ জড়িয়ে যাচ্ছে নিশ্বাসের সঙ্গে। কিন্তু অমন চুপ করে কেন বসে আছে পূর্ণেন্দু। এমন ধরণের কেন লোকটি। কথা নেই মুখে। মন তার নেই এখানে। সারাক্ষণের মধ্যে একটিবারও তার দিকে তাকিয়ে দেখেনি পূর্ণেন্দু। না দেখেই কি সে তাকে অপছন্দ করতে চায়। না এ কেবল ভাণ—পুরুষের ইচ্ছাকৃত ঔদাসীন্য। পূর্ণেন্দুর বাবাই অবশ্য দেখে শুনে উমাকে পছন্দ করে গিয়েছিলেন। কথা-বার্তাও প্রায় পাকাপাকিই ঠিক হয়ে ছিল। কিন্তু শেষ সমর্থনের ভার ছিল পূর্ণেন্দুর ওপরই। পূর্ণেন্দু আসে নি। বহু অনুরোধ পীড়াপীড়ির পর সে নাকি মন্তব্য করেছিল, 'আর নতুন করে দেখবার কি আছে; দেখাটা না হয় সেই শুভদৃষ্টির সময়ই হবে। হিন্দু বিবাহের রোমান্সকে একটুর জন্য নষ্ট করব কেন?'

তবু কনে পক্ষ থেকে আসবার জন্য পূর্ণেন্দুকে আর একবার আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। আনতে গিয়েছিল উমার ছোট ভাই। পূর্ণেন্দু বলেছিল, 'বুঝতে পারছি দেখা শোনার প্রয়োজনটা কেবল এক তরফা নয়। কিন্তু যদি দরকার হয় তিনি আসুন।'

উত্তর শুনে উমা কৌতুক বোধ করেছিল, চমৎকৃতও হয়েছিল কিছুটা, কিন্তু কোন রকম বিদ্বেষের ভাব তার মনে আসে নি। বরং পূর্ণেন্দুর ব্যবহার এক হিসাবে তার কাছে সমর্থন যোগ্যই মনে হয়েছিল। বিয়ের আগে সত্যিই যেখানে দীর্ঘদিন ধ'রে আলাপ পরিচয় মেলা মেশার সুযোগ নেই, সেখানে কেবল অভিভাবকদের মতামতে ভিটো দেওয়ার জন্য মুহূর্তের জন্য দৃষ্টি বিনিময় ক'রে লাভ হবে কি? তাতে কতটুকুই বা দেখা যাবে মানুষটির। কিন্তু বিয়ের আসর থেকে বাসর পর্যন্ত সর্বত্রই পূর্ণেন্দুর আচার আচরণ শুধু অভিনব

নয়, অদ্ভুত আর অস্বাভাবিক লাগছে উমার কাছে। বিয়েতে কি পূর্ণেন্দুর ইচ্ছা ছিল না? তাই যদি, জোর করে সে অস্বীকার করলেই পারত। কিন্তু আসলে মানুষটির বোধ হয় জোর করবার কোন ক্ষমতা নেই। জোর করে কিছু সে অস্বীকার করতেও পারে না। এমন ধরনের মানুষের কথা অনেক শুনেছে উমা, পড়েছে গল্প উপন্যাসে কিন্তু তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় এই শুভদৃষ্টির জন্যই যে অপেক্ষা করেছিল, তা কে জানত?

ঘিয়ের প্রদীপের বুকের মধ্যে সলতে পুড়ে যাচ্ছে। উমা উঠে গিয়ে সলতেটা উসকিয়ে দিয়ে এল। দোরে খিল দিয়ে এল। রাত শেষ হয়ে আসছে, ঘুমুতে তো হবে। তারপর আবার এসে বসল, তক্তপোষের এক পাশে, হঠাৎ পূর্ণেন্দুর অন্যমনস্ক মুখের দিকে চোখ পড়ল উমার। এতক্ষণ ভালো করে সেও তাকায়নি পূর্ণেন্দুর দিকে; সরাসরি চেয়ে দেখতে কেমন লজ্জা বোধ করছে। এবার দেখতে সাধ। পূর্ণেন্দু অন্যদিকে চেয়ে কি ভাবছে, তার দিকে তাকালে সে টের পাবে না।

কিন্তু ওদিকে না চাইলেও সবই পূর্ণেন্দু টের পাচ্ছে। সবই বুঝতে পারছে পূর্ণেন্দু। সে রাত্রে সেও এমনি পাশেই বসেছিল। অতটুকু ব্যবধানও রাখেনি। আরো কাছে এসে একেবারে গা ঘেঁষেই বসেছিল পূর্ণেন্দুর। তারপর হেসে বলেছিল, 'হ্যাগা, অমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলে কেন? আমাকে কি পছন্দ হচ্ছে না, মনে ধরছে না বুঝি? কেন আমি কি এতই খারাপ দেখতে?'

পূর্ণেন্দু অদ্ভুত একটু হেসেছিল, 'না একেবারে পরীর মত।'

সে হঠাৎ চুপ করে গিয়েছিল, তারপর একটু যেন আহত হয়ে বলেছিল, 'এখন ঠাট্টা করছ, কিন্তু ছিলাম গো; একদিন প্রায় পরীর মতই ছিলাম। সেদিন তো তুমি আস নি। সেদিন তো দেখনি আমাকে।'

মনে মনে একটু আপশোষ করেছিল পূর্ণেন্দু। ওরকম একটা

খোঁচা দেওয়া কথা ওকে না বললেই হোত। মেয়েটির বয়সের কালের চেহারা পূর্ণেন্দু দেখেনি। কিন্তু বয়স হারাবার ব্যাথাটা ওর মুখে সেদিন দেখতে পেয়েছিল। সেইজন্যই কি মুখখানা পূর্ণেন্দু আজও ভুলতে পারে নি?

মুখ ফেরাতেই আর একটি মুখের সঙ্গে পূর্ণেন্দুর চোখাচোখি হল।

পূর্ণেন্দু ফের সজাগ হয়ে উঠল, নতুন জায়গা নতুন পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন হল। একটু হেসে বলল, 'কী দেখছ?'

ধরা পড়ে গিয়ে উমা লজ্জিত হয়ে বলল, 'আমি আবার কী দেখব।'

পূর্ণেন্দু বলল, 'ও তাহলে আমিই দেখছিলাম।' কুমকুম চন্দনের ফোঁটা দেওয়া একখানি মুখ। কাজল পরা একজোড়া চোখ লজ্জায় আনত। পূর্ণেন্দু সত্যিই এবার ভালো করে তাকিয়ে দেখল।

সেদিকে তাকিয়ে পূর্ণেন্দুর মনে হল বয়সে বিরূপ আর একখানি কালো মুখের ছায়া যেন পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এখন পূর্ণেন্দুর ভরসা হচ্ছে সে ছায়া বেশি দিন থাকবে না। তা মুছে যাবে মিলিয়ে যাবে। কায়ার পাশে ছায়ার অস্তিত্ব আর কদিনের?
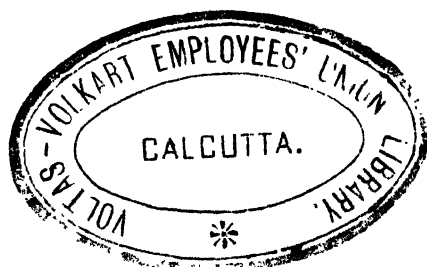
॥ দূত ॥

এর আগে বেশ জোর এক পশলা হয়ে গেছে। এখন খানিকক্ষণ ধরে টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। রাত সাড়ে নটা।

স্থরেন বাবু এখনও এলেন না।

শীতাংশু আর তার স্ত্রী শিপ্রা দুজনেই তাদের একজন অতিথির জন্যে অপেক্ষা করছিল। আর মাঝে মাঝে দরজা খুলে বাইরের দিকে তাকাচ্ছিল। রাস্তায় কাউকে দেখা যায় কিনা। এসে পৌঁছলেন কিনা ভদ্রলোক।

স্থরেনবাবু আসেন নি। কিন্তু তাঁর ছেলে স্থজিত এসে আগে থেকেই বসে রয়েছে। নৈশ ভোজে বাপের সঙ্গে তারও এ বাড়িতে নিমন্ত্রণ। কিন্তু সে প্রধান অতিথি নয়। প্রধান অতিথি তার বাবা।

বসবার ঘরে মুখোমুখি দুটি চেয়ারে বসে স্থজিতের সঙ্গে নানা বিষয় নিয়ে কথা বলছিল শীতাংশু। আর মাঝে মাঝে গানের ধুয়ার মত থেকে থেকে বলে উঠছিল, 'তোমার বাবা বোধ হয় আর এলেন না।'

স্থজিত বলছিল, 'না না তিনি কথা যখন দিয়েছেন নিশ্চয়ই আসবেন।'

শীতাংশু একটু হেসে বলল, 'তিনি আটটায় আসবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। এখন সাড়ে নটা বেজে গেল। বারটার মধ্যে আসবেন তো?'

স্থজিত বলল, 'তা আসবেন, বাবা যখন কথা দিয়েছেন। তিনি তো কথার খেলাপ করেন না। তবু এত দেরি হচ্ছে কেন তাই ভাবছি। ওয়েদারটাও ভালো না।'

কথার সুরে একটু উদ্বেগ প্রকাশ পেল সুজিতের। পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের সুদর্শন যুবক। গায়ের রঙ উজ্জ্বল গৌর। মুখের স্মিত হাসি তার লাবণ্যকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। সুজিত এতক্ষণ সমকালীন সাহিত্য রাজনীতি সমাজ নীতির ওপর দিয়ে তার আলাপের নৌকো ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। সেই নৌকো মুহূর্তের জন্যে একটু আকস্মিক উদ্বেগের আঘাটায় এসে ঠেকল।

সুজিত বলল, 'বাবা কেন যে এত দেরি করছেন—।'

শীতাংশু বলল, 'বাইরের থেকে কলকাতায় এসেছেন নিশ্চয়ই বন্ধু-বান্ধবদের কোন আড্ডায় জমে গেছেন। বক্তা মানুষ বক্তৃতার তোড়ে সেই আটটায় আসবার কথা কখন ভেসে গেছে।'

সুজিত বাবার জন্যে একটু লজ্জিত হল। অসম্ভব নয়। বাবা হয়তো কালীঘাট কি ভবানীপুরের কোন বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে গল্পে গল্পে এখানে আসবার কথা ভুলেই গেছেন। ছি ছি ছি তাহলে বড় অন্যায় হবে। বাবা যদিও ষাট বছরের বৃদ্ধ তবু এতখানি বিভ্রান্তি সমর্থন করা যায় না। এরা সব আয়োজন করে বসে আছেন। আর তিনি যদি অন্য কারো বাড়ি থেকে খেয়ে আসেন—। ছি ছি ছি ব্যাপারটা বড়ই বিসদৃশ হবে।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে শীতাংশু ফের একটু হাসল, 'তুমি সুরেনবাবুকে একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে এলেই পারতে।'

সুজিত বলল, 'তাইতো কথা ছিল। কিন্তু আমি সোজা অফিস থেকে এসেছি আর বাবা গেছেন তাঁর দক্ষিণ কলকাতার বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ সারতে। কিছু দরকারী কথাও আছে তাঁদের সঙ্গে। কাজ সেরে এখানে চলে আসবেন। দেখুন দেখি কাণ্ড।'

এরপর সুজিত একটু হাসল, 'তাছাড়া, বাবার এক ধরনের কমপ্লেকস্ আছে জানেন শীতাংশুদা? তিনি পারত পক্ষে আমাদের সঙ্গে বেরোতে চান না। বলেন, কেন, কাশীতে থাকি বলে আমি কি এতই মফঃস্বলের মানুষ হয়ে গেছি। তোদের কলকাতা শহর আমি

চিনিনে? তোদের কলকাতা আজই তোদের কলকাতা। কিন্তু আমার বহুকালের—। বাবা বোধহয় কর্মক্ষেত্র কথাটাই বলতে যাচ্ছিলেন, আমি বলে দিলাম বিচরণ ক্ষেত্র। সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক গম্ভীর হয়ে গেলেন।'

সুজিত হাসতে লাগল। তারপর হাসতে হাসতে বলল, 'আমাকে নিয়ে চলা-ফেরা করতে বাবার বোধহয় পৌরুষে বাধে। উত্তর পুরুষকে নিয়ে তার বন্ধুদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে এখনো বোধহয় ওঁর লজ্জা হয়। যদিও এখন আর কেউ তাঁরা যুবক নন, প্রত্যেকেরই নাতি-নাতনী হয়ে গেছে কিন্তু এক জায়গায় সব জড় হলেই তাঁরা নিজেদের বয়সের কথা ভুলে যান। মনে থাকলেও মুখে স্বীকার করতে চান না। বাবা একেবারে আধাআধি ছেঁটে দিয়ে বলেন তাঁর বয়স তিরিশ, ওঁর বন্ধুরা আরো কমাতে থাকেন।'

হাসতে লাগল সুজিত।

শিপ্রা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল। সুজিতের কথায় সেও মৃদু হেসে বলল, 'তুমি কাকে কী বলছ সুজিত। যাঁর কাছে বলছ এ ব্যাপারে তিনিই কি কিছু কম যান নাকি? শিবু—আমার যে ছেলে তোমাদের বেনারসে পড়ছে তাকে সঙ্গে নিয়েও কি উনি সহজে কোথাও বেরোতে চাইতেন? পাছে বন্ধুরা দেখে ফেলে, বান্ধবীদের কেউ দেখে ফেলে। তাদের কাছে তো উনি চিরকুমার। আমিও আসিনি আমার ছেলেরাও কেউ এখনো আসেনি।'

শীতাংশু লজ্জিত হয়ে বলল, 'যাঃ, কী যে বলো।'

শিপ্রা বলল, 'একদিন কী কাণ্ড হয়েছে শোন। শিবুকে নিয়ে উনি তো গেছেন কলেজ ষ্ট্রীটে। দূর থেকে এক বান্ধবী ওঁকে দেখে হাসতে হাসতে এগোচ্ছে কিন্তু এদিকে বন্ধুবরের তো মুখ-শুকিয়ে চুন। ছেলে আছে যে সঙ্গে! উনি শিবুর কানে কানে বলে দিলেন, 'খবরদার, ওই মহিলাটির সামনে আমাকে বাবা-টাবা পাছে বলিস! স্রেফ দাদা বলে চালিয়ে দিবি।'

শীতাংশুর ক্ষীণ প্রতিবাদ সুজিতের উচ্চ হাসির শব্দে তলিয়ে গেল।

সেই হাসি থামল কড়া নাড়ার শব্দে। বাইরের বৃষ্টিটা ফের একটু জোরে এসেছে। কড়ার কম্পন তাকে ছাপিয়ে গেল।

শিপ্রা এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিয়ে একটু পিছিয়ে এসে বলল, 'কে।'

'এইটাই কি শীতাংশুবাবুর বাড়ি?'

শীতাংশু দোরের কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'আরে এই যে সুরেনবাবু, আসুন আসুন।'

বৃষ্টির জলে ভিজে চুপসে যাওয়া ছোটখাট এক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন।

শিপ্রা সুজিতকে চেনে। কিন্তু তার বাবা সুরেনবাবুর সঙ্গে এই প্রথম দেখা। ভদ্রলোকের এই অবস্থা দেখে একটু হতভম্ব হয়ে সরে দাঁড়াল।

শীতাংশু পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, 'ইনিই সুজিতের বাবা সুরেন্দ্রনাথ রায় আর এ আমার—।'

সুরেনবাবু হেসে বললেন, 'বুঝতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি। মা লক্ষ্মী প্রথমে তো আমাকে ভূত ভেবে চমকে উঠেছিলেন। তা একদিক থেকে আমরা তো এখন ভূতেরই সামিল হয়ে গেছি। সব বিগত যুগের মানুষ।'

সুজিত ইজিচেয়ারটা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'বাবা, এ কী দশা হয়েছে তোমার। এমনভাবে ভিজলে কী করে। তোমার সঙ্গে তো ছাতা ছিল। সে ছাতাই বা গেল কোথায়?'

সুরেনবাবু বললেন, 'রাখো বাপু রাখো। একটু দাঁড়াতে দাও। এসে পৌঁছেছি যখন সবই বলব।'

শীতাংশু বলল, 'বসুন, আপনি বসুন।'

কিন্তু শিপ্রা ততক্ষণে শীতাংশুর একখানি ধুতি নিয়ে এসেছে।

'আপনি কাপড়টা ছেড়ে ফেলুন।'

সুরেনবাবু লজ্জিত হয়ে বললেন, 'না না, আমার কাপড় তেমন ভেজেনি। জামা কাপড় একেবারে বাসায় গিয়েই বদলাবো।'

শিপ্রা বলল, 'তা কি হয়। ভিজে কাপড়ে এতক্ষণ থাকলে আপনার অসুখ করবে। আপনি কাপড়টা পালটে নিন, কোন সংকোচ করবেন না।'

সুরেনবাবু একটু হেসে বললেন, 'মা যখন ছাড়বেনই না—চলুন।'

বাড়ির ভিতরে গিয়ে কাপড় বদলে এলেন সুরেনবাবু।

সুজিত বলল, 'বাবা, তুমি জামাটাও ছেড়ে ফেল। তোমার খদ্দরের জামা ভিজে একেবারে ঢোল হয়ে গেছে। বেশি ঠাণ্ডা লাগলে ব্রোঙ্কাইটিস ট্রোঙ্কাইটিস হয়ে বসবে। তুমি বরং আমার জামাটা পর।'

সুরেনবাবু বললেন, 'না বাপু, তোমার ওই পাটভাঙা সিল্কের পাঞ্জাবি আমার গায়ে মানাবে না। তা ছাড়া আজকালকার দিনে ছেলের জামা ভিক্ষে করা যা যৌবন ভিক্ষে করাও তাই। জামা আজকাল যৌবনের মতই দুর্মূল্য। আমিও অতি লোভী যযাতি রাজা নই, তোমারও পিতৃভক্ত পুরু হয়ে দরকার নেই বাবা।'

সবাই হাসতে লাগল। গৃহি আর গৃহিণীর অনুরোধে শেষ পর্যন্ত শীতাংশুর একটা পুরোন জামা সুরেনবাবুকে পরতেই হ'ল।

এবার তিনি চেয়ারে চেপে বসে সিগারেট ধরালেন। তারপর শীতাংশুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মহা বিপদে পড়ে গিয়েছিলাম মশাই।'

সুজিত বলল, 'এমন ভিজে গেলে কী করে? তোমার ছাতাটাই বা কোথায় ফেলে এলে?'

সুরেনবাবু ছেলের কথায় কোন জবাব না দিয়ে শীতাংশুকেই বলতে লাগলেন, 'আপনাকে কথা দিয়েছি আটটায় আসব। সেই হিসেব করে এক ঘণ্টা সময় হাতে রেখে আমি কালীঘাট থেকে দু'নম্বর

বাসে রওনা হয়েছি। বন্ধুরা আমাকে লোভ দেখিয়েছিল। ব্রীজের আসরে গান-বাজনার লোভ, বৃষ্টির দিনে ডিমভাজা আর খিচুড়ীর লোভ জয় করে ছাতা হাতে বাসে উঠে পড়লাম। তখনো বেশ বৃষ্টি হচ্ছে। আপনাদের কলকাতার বাস ট্রামে তো আর সময় অসময় নেই। অষ্ট প্রহর ভীড় লেগেই আছে। সেই ভীড়ের মধ্যে একটি আসন দখল করা মানে সিংহাসন দখল করা। আমি একটি সীটে বসতে পেরে জীবনের এক পরম অ্যাচিভমেণ্টের স্বাদ পেলাম। আমার পাশের ভদ্রলোক আমার চেয়েও রোগা আর নির্বিরোধ। যুগল আসনের দশআনি আমি নিলাম, ছ'আনি তিনি। তাতেও তাঁর আপত্তি নেই। ছাতাটা দুই হাঁটুর মধ্যে চেপে রেখে আমি ঠেস দিয়ে বসলাম। চৌরঙ্গী পার হবার পর থেকেই আমার ঝিমুনি এল। নাতি-নাতনীদের দৌরাত্ম্যে আজ আর দুপুরের নিদ্রাটুকু হয়নি। তারপর এই বৃষ্টির সন্ধ্যা। দু'টি চোখ যদি একটু আরাম পেয়ে বুজে আসতেই চায় তাদের দোষ দিতে পারিনে। ছোকরা কণ্ডাক্টরকে ডেকে বললাম, মণীন্দ্র রোড এলে আমাকে ডেকে দিয়ো বাবা। কিন্তু বাপ ডেকেও তার মন গলাতে পারলাম না। সে তিরিক্ষে মেজাজে বলল, 'ঢের দেরি আছে। আপনি চুপ করে বসুন।' পরে বুঝতে পারলাম তুমি বলায় সে অফেন্‌স্ নিয়েছে। আমার পাশের ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'আপনি কিচ্ছু ভাববেন না। আমি শ্যামবাজারে নামবার সময় আপনাকে ডেকে দিয়ে যাব।'

কিন্তু নামবার সময় ভদ্রলোক বোধহয় ভুলে গিয়েছিলেন, নাকি ঘুমন্ত মানুষকে তুলে দিতে তাঁর সংকোচ হয়েছিল, নাকি তাঁর জায়গা জবরদখল করেছিলাম বলে তিনি শোধ নিলেন জানিনে। মোট কথা তিনি আমাকে জাগিয়ে দিয়ে গেলেন না, কণ্ডাক্টরের ধমকেই আমি একসময় উঠে বসলাম। 'কই বড়দা,—মণীন্দ্র রোডে যে নামবেন বলেছিলেন, নামুন নামুন। এই তো মণীন্দ্র রোড। মহা ফ্যাসাদ হয়েছে। একে তো এই হাড়ভাঙা খাটুনি তারপর আবার প্যাসে-

ড্রায়কে ঘুম থেকে তুলে হাত ধরে নামাও। পার্টনার বাঁধবেন একটু, লেডীজ আছে।' একি আমাকে একেবারে মহিলা বানিয়ে দিল। বালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে বোধহয় বনিতাদের সম্বন্ধেই ওদের কনসিডারেশন বেশি। না হলে হয়তো ড্রাইভার অস্থানে গাড়ি থামাত না। যাই হোক্ আমি এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামালাম না। ছাতা হাতে ধড়মড় করে বাস থেকে নেমে পড়লাম। তখন সেই জোর বৃষ্টিটা এসেছে। সামনে জল, পিছনে জল, ওপরে জল, নিচে জল, আমি একেবারে অকূল পাথারে পড়লাম। দু'দিকে সারি সারি বস্তী বাড়ি। কিন্তু কুটীরে কুটীরে বন্ধ দ্বার। রাস্তায়ও জনমানব নেই। রাস্তাই বা কোথায়! হাঁটু অবধি জল। কে বলবে যে কলকাতার শহর। যেন আমাদের সেই পূর্ববঙ্গের এক বিলের মধ্যে নেমে পড়েছি। আমার চোখের ঘুমের আবেশ অনেকক্ষণ কেটে গেছে তবু পথ দেখতে পেলাম না। একেই তো রাত্রে আমি একটু কম দেখি তারপর রাস্তায় আলো একেবারে নেই। আমি চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলাম। সামনে এগোই না পিছনে ফিরি ভেবে পেলাম না। হঠাৎ চোখে পড়ল মোড়ের পানবিড়ির দোকানটা তখনো খোলা রয়েছে। টিম টিম করে একটা আলো জ্বলছে। হ্যাঁ ইলেকট্রিক বালবই। কিন্তু আমার চোখে মনে হল যেন কেরোসিনের ডিবে। আমি দোকানের মালিককে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা এখানে শীতাংশু সেনের বাড়ি কোনটা বলতে পার?' দোকানী আমাকে ধমক দিয়ে বলল, 'নম্বর বলুন মশাই নম্বর বলুন। এখানে নামে কোন কাজ হয় না।' এদিকে আপনার বাড়ির নম্বরটা আমার ঠিক ভালো করে মনে পড়ছে না। একবার মনে হচ্ছে উনিশ কি বিশ আর একবার মনে হচ্ছে বাইশ কি তেইশ। অবশ্য বাইনাম্বারও আছে। কিন্তু গোটা নম্বরটা একবার বার করতে পারলে তার ভগ্নাংশটাও কি খুঁজে নিতে পারব না? কিন্তু দোকানী বলল, 'এখানে উনিশ আর বিশে অনেক তফাৎ। বাইশ আর তেইশেও

তাই। আপনি যাবেন কোথায় বলুন তো?' আমি তাকে পাল্টা জিজ্ঞেস করলাম, 'এ জায়গার নাম কি।' সে বলল, 'দত্ত বাগান।' আমি বললাম, 'বাগান কোথায় এ যে সরোবর।'

দোকানী বিরক্ত হয়ে বলল, 'আপনার কিছু দরকার থাকে তো বলুন। বক বক করবার আমার সময় নেই। ঢের কাজ আছে।' আমি তার মন ভেজাবার জন্যে এক প্যাকেট সিগারেট চাইলাম। সে এবার একটু খুশি হয়ে সিগারেট দিল। টাকা দিলাম চেঞ্জ দিল। মিছি মিছি একটা কাঠি কেন খরচ করব ভেবে আমি তার দড়ির আগুনে সিগারেট ধরালাম। তারপর তার সেই চালার আশ্রয় থেকে বেরিয়ে আসবার জন্যে ছাতাটা নিতে গিয়ে দেখি ছাতা নেই। এ কী তাজ্জব কাণ্ড। কতকগুলি ছোকরা আশেপাশে জটলা করছিল, আমি তাদের জিগ্যেস করলাম, 'আমার ছাতা কই?' একজন বলল, 'ছাতা তো এখানে আনেন নি বাবু, বোধহয় বাসে ফেলে এসেছেন।'

আমি বললাম, 'না না আমি ঠিক এনেছি। আমার বেশ মনে আছে।' তখন আর একজন বলল, 'তাহলে বোধহয় নর্দমায় পড়ে ভেসে গেছে বাবু। দেখছেন কী জলের তোড়?'

পিছনেই অবশ্য একটা খোলা নর্দমা আছে। সে নর্দমা এখন নর্মদার মত কলনাদিনী। কিন্তু আমার ছাতাটা পড়লই বা কখন আর ভাসল কি ডুবলই বা কখন? ছোঁড়াগুলি 'চলরে চল' বলে হাসতে হাসতে সেখান থেকে বেরিয়ে গেল। আমি বুঝতে পারলাম ডাকুদের হাতে পড়েছি। পুলিস ডাকতে সাহস হল না। ডেকে কি তাকে পাব? বেরিয়ে আসতে না আসতেই হঠাৎ ফের ঝপ ঝপ করে বৃষ্টি। মনে মনে বললাম, 'হে বিশ্বনাথ! এ কী পরীক্ষা তোমার। এই দুঃসময়ে আমার ছাতাটিও কেড়ে নিলে।' আমি জল ভেঙে ভেঙে সামনের দিকে এগোতে লাগলাম। পথে আরো দু-এক-জনকে দেখতে পেলাম। তারা আমার মত হতভাগ্য নয়। তাদের ছাতা আছে। আমি তাদের আপনার নাম বললাম, আন্দাজে

আন্দাজে বাড়ির ঠিকানাও দিলাম। কেউ বলল চিনিনে, কেউ বলল এখান থেকে অনেক দূর। আর সেই মুহূর্তে হঠাৎ নিজেকে আমার বড় অসহায় মনে হল। এই বিশ্ব সংসারের মাঝখানে আমি যেন চিরদিনের জন্যে হারিয়ে গেছি। একেবারে নিঃস্ব নিঃসঙ্গ হয়ে গেছি আমি। কোনদিন যেন কোথাও আর কোন আশ্রয় খুঁজে পাবনা। আমার মনে হল আপনারা আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আমার কথার খেলাপ হয়ে যাচ্ছে। অতিথি হিসেবে আমি আমার কর্তব্য করতে পারছিনে। কিন্তু আমি তো উপায়হীন অবলম্বনহীন। আমি যদি নাই রইলাম আমার কর্তব্যই বা কিসের আর প্রতিশ্রুতিই বা কিসের। আর এ সংসারে শুধু কি আমিই অতিথি। যৌবন অতিথি জীবন অতিথি। এখানে স্থায়ী বাসা বাঁধতে পারে কে? আমাকে যেন ভূতে পেয়ে গেল। সারা রাস্তাটা কতবার যে ঘোরাঘুরি করলাম তার আর ঠিক নেই। একবার সামনে এগোই আর একবার পিছনে হটি। আপনার বাড়িটা কাছেই কোথাও আছে। অথচ তা যেন এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যের আড়ালে লুকোন। আমি কিছুতেই তার রহস্য ভেদ করতে পারছিনে। সারা রাতটাই হয়তো এইভাবে কাটত। শেষে এক ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কাকে খুঁজছেন বলুনতো।' আমি আপনার নাম বললাম, বাড়ীর নম্বরটাও আন্দাজে বলে দিলাম। তিনি বললেন, 'আপনি তো অনেক পিছনে ফেলে এসেছেন। চলুন আপনাকে এগিয়ে দিই। তিনিই আমাকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন।'

সুরেনবাবু থামলেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল।

সুজিত বলল, 'এত করে বলি তুমি হয় আমার সঙ্গে না হয় দাদার সঙ্গে বেরিয়ো। কথা মোটে শুনবে না।'

ছেলের এই শাসন সুরেন বাবু হাসিমুখে মেনে নিলেন।

খাবার ঘরে ডাক পড়ল। টেবিলে বসে নানা আলোচনার সঙ্গে

শিবুর কথাও উঠল। শিবু যে শহরে পড়তে গেছে সুরেনবাবু সেই বারাণসীরই অধিবাসী। শীতাংশুই দুজনের আলাপ পরিচয় করিয়ে দিয়েছে।

সুরেনবাবু বললেন, 'আমি তার খোঁজ-খবর নিয়মিত নিচ্ছি সেও আমার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে আসে। ছেলেই হোক মেয়েই হোক বড় হলে ক'দিন আর তাকে কাছে রাখা যায়? এইতো আমার ছেলে মেয়েরাও তো সব দূরে দূরেই থাকে। আমরা বুড়ো-বুড়ী শুধু দুজনে কাশীতে আছি। কবরেজী ব্যবসা করে খাই। লোকজন এখন আর রাখতে পারিনে। সে দিনকাল আর নেই। বুড়ী বড়ি তৈরি করে। আমি রোগীকে খাওয়াই।—মাছটা বড় ভালো হয়েছে।'

শিপ্রা আরও দুখানা ইলিশ মাছ সুরেনবাবুর পাতে তুলে দিতে দিতে বলল, 'ওখানে বুঝি ইলিশ মাছ পাওয়া যায়না? শিবু ইলিশ মাছ বড় ভালোবাসে।'

সুরেনবাবু হেসে বললেন, 'তাই বুঝি আমাকে খাওয়াচ্ছেন?'

খাওয়া দাওয়ার পর আরও দশ পনেরো মিনিট গল্পটল্প হল। সুরেনবাবু আবার জমে যাচ্ছিলেন কিন্তু সুজিত তাঁকে তাড়া দিয়ে বলল, 'ওঠো বাবা, এরপর আর সিঁথির বাস পাওয়া যাবেনা।'

দুজনে উঠে পড়লেন। সুরেনবাবু আপত্তি করলেও সুজিত তার ওয়াটারপ্রুফটা বাপের গায়ে পরিয়ে দিল।

সুরেনবাবু হেসে বললেন, 'এবার সত্যিই আমাকে ভূত সাজালি।'

সুজিত তার বাবার ভিজে জামা-কাপড়ের পুটলী নিজের হাতে তুলে নিল, তারপর শিপ্রার দিকে চেয়ে হেসে বলল, 'বউদি, শীতাংশু-দার জামা-কাপড় কাল পৌঁছে দিয়ে যাব।'

শিপ্রা বলল, 'আচ্ছা আচ্ছা। যা মূল্যবান সম্পত্তি। ও রাজ-পোশাক দুদিন পরে পেলেও কোন ক্ষতি হবেনা।'

নমস্কার বিনিময়ের পর বাপ আর ছেলে বড় রাস্তার দিকে এগোতে লাগলেন।

শীতাংশু আর শিপ্রা দরজায় দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। শীতাংশু একটু হেসে বলল, 'বেশ দেখাচ্ছে। না? এবার আর সুরেনবাবুর হারাবার ভয় নেই।'

শিপ্রা বলল, 'তা ঠিক। আচ্ছা শিবুদের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ তো চব্বিশে ছুটি হবে, তাই না?'

শীতাংশু বলল, 'তাইতো লিখেছে। সুরেনবাবুও তো তাই বললেন।'

শিপ্রা নিজের মনেই বলল, 'চব্বিশের আর কদিন বাকি।'

শীতাংশু এ কথার কোন জবাব না দিয়ে সামনের দিকে তাকাল। সুরেনবাবু পুঁটলিটা নিজের হাতে নিতে চাইছেন। কিন্তু সুজিত কিছুতেই তা দিচ্ছেনা। আর তাঁর বিপুল আপত্তি সত্ত্বেও রাস্তা পার করে দেওয়ার জন্যে সে বাপের হাত ধরেছে।

এখনও বেশ জল জমে আছে রাস্তায়।

॥ সুদ ॥

ভদ্রলোকের সঙ্গে পার্কেই আমার প্রথম আলাপ। রোজ সকালে আমিও বেড়াতে যাই, তিনিও আসেন। অবশ্য রোজই যে আমরা একই সঙ্গে পার্ক প্রদক্ষিণ করি তা নয়। কোন কোনদিন এমনও হয়, তিনি ঢুকছেন, আমি বেরোচ্ছি, কোনদিন বা আমি শুরু করি তিনি সারা করেন।

প্রথম আলাপে আমরা কেউ কারো নাম জানতাম না, ধাম জানতাম না। বৃত্তি প্রবৃত্তি সবই অজ্ঞাত ছিল। প্রথম প্রথম দেখা হলে তিনিও বলতেন, 'এই যে।' আমিও বলতাম, 'এই যে।' তার পর আমরা আর কেউ কিছু বলতাম না। যেন আমরা তুটি শিশু। মুখে সবে বোল ফুটতে শুরু করেছে। মাতৃভাষার তু-চারটি শব্দের বেশি আমরা কেউ আয়ত্ত করতে পারিনি।

কিন্তু দিনকয়েক যেতে যেতেই আমি টের পেলাম, তিনি মোটেই মিতভাষী নন। তিনি কথা বলতে ভালোবাসেন। বলেনও। আবহাওয়া নিয়ে কথা বলেন, সামাজিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা করেন, অনাচার-অবিচারের সমালোচনা করেন। দেশের রাজনীতি, অর্থনীতির অনেক অসঙ্গতি সম্বন্ধেও তাঁর কিছু-না-কিছু বক্তব্য আছে।

আমি কখনো হুঁ করি, কখনো হাঁ। কিন্তু বেশির ভাগ দিনই একেবারে নীরব থাকি। আমি জানি বিতর্কের আভাস মাত্র পেলে আর রক্ষা থাকবে না। ভদ্রলোকের বক্তৃতার পরিমাণ বহু গুণে গুণান্বিত হবে।

সকাল বেলায় আমি নৈঃশব্দ ভালোবাসি। মনে মনে ভাবা, সে-ও তো এক ধরনের কথা বলা। চিন্তা আমাদের নিঃশব্দ ভাষণ। বাইরে তার কোন ধ্বনি নেই, কিন্তু অন্তরে সুর আছে। তার স্বর-

লিপি হয়তো আলাদা। আমার সঙ্গী ভদ্রলোকের অভ্যাস অন্য-রকম। সকাল থেকেই তিনি প্রচুর কথা বলতে শুরু করেন। নানা বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা, নানা বিষয়ে তাঁর বক্তব্যের ব্যাপ্তি।

মাঝে মাঝে তাঁর অবশ্য খেয়াল হয়। আমাকে মৌন দেখে হঠাৎ এক-একদিন জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনাকে বিরক্ত করছি না তো?'

মনে মনে বলি, 'নিশ্চয়ই করছেন।'

কিন্তু মুখে বলতে হয়, 'না না না।'

তিনি বলেন, 'বুড়ো মানুষ। একটু বেশিই বোধ হয় কথা বলি। কিছু মনে করবেন না যেন।'

আমি তাঁকে ভরসা দিই, 'না-না, মনে করবার কী আছে।'

আমার কাছ থেকে তেমন কোন সাড়া কি উৎসাহ না পেয়েও তো তিনি কথা বলতে থাকেন। হয়তো আসলে তিনিও তাঁর নিজের সঙ্গেই কথা বলেন। হয়তো আমার মত তিনিও চিন্তা করে যাচ্ছেন। সশব্দে চিন্তা।

ভদ্রলোক একদিন বললেন, 'আপনার গুণ আছে। বুড়ো মানুষকে আজকালকার দিনে কেউ বড়-একটা আমল দিতে চায় না। কিন্তু আপনি—।'

মনে মনে লজ্জিত হই। ভিতরে ভিতরে আমিও তো ওঁকে তেমন আমল দিইনি। অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত কাছে টেনে নিতে পারিনি। এত কাছাকাছি থেকেও কী কৌশলে ওঁকে কত দূরেই না সরিয়ে রেখেছি। তিনি যত খুশি আমার কান ঝালাপালা করুন, চারদিকে দুস্তর পরিখার পরিবেষ্টনী দিয়ে আমার মনোদুর্গকে আমি দুষ্প্রবেশ্য করে রেখেছি। এইটুকু শক্তি আমার আছে। আমি ইচ্ছা করলে আমার হৃদয়দ্বার খুলতেও পারি নাও খুলতে পারি। এমন কি, না খুলেও খুলে রাখবার ভাণ করতে পারি। আমি তৃষ্ণার্তের কাছে জলও হতে পারি, মরীচিকাও হতে পারি। আমি সেই ঐন্দ্রজালিক যাদুবিদ্যার অধিকারী।

ভদ্রলোক বৃদ্ধ। তা ঠিক। খুবই বৃদ্ধ। দেখে মনে হয়, সত্তর পার হয়ে গেছেন। কি এপারেও থাকতে পারেন। মাথায় এক-গাছিও চুল নেই, মুখে একটিও দাঁত নেই। দেহে শুধু যে লাবণ্য নেই তাই নয়, মেদও সামান্য। লম্বাটে চেহারা, একটু সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। এই নম্রতা শুধু জরার ভারজনিত বলে মনে হয় না। ভদ্রলোকের পরনে খাটো ধুতি, গায়ে আধময়লা পাঞ্জাবি। ঘাড়ের কাছে ছেঁড়া। জীবন-যুদ্ধে বিজয়ী সেনানীর পরিচ্ছদ একে বলা যায় না। ভদ্রলোক একদিন তাঁর দুর্ভাগ্যের কথা বলেও ছিলেন। ছেলে একটি আছে। কিন্তু তার চাল-চুলো, মতিগতির কিছু ঠিক নেই। সে বাড়িতেও আসে না। বাপের কোন খোঁজ-খবরও নেয় না। কী করে, কোথায় থাকে, ভদ্রলোক তা জানেন না। জেনে কোন লাভও নেই। মেয়েও একটি আছে। সে বিধবা। ছ মাসের ছেলে কোলে নিয়ে বিধবা হয়েছে। সেই ছেলের বয়স আজ দশ বছর।

ভদ্রলোক বলেছিলেন, 'যা করবার কথা ছিল না, তাই করে যাচ্ছি। যে মেয়েকে পার করে দিয়েছিলাম মশাই, সে আবার আমার ঘরেই ফিরে এল। আমার ঘাড়ে এসেই পড়ল। তা-ও একা নয়। একটি বাচ্চা নিয়ে। অদৃষ্টের কথা কী আর বলব। ছেলেটি সরে পড়ল, জামাইটিও এই বুড়ো মানুষের ওপর সব বোঝা চাপিয়ে দিয়ে চলে গেল। আমার হয়েছে মহাজ্বালা। না পারি সইতে না পারি বইতে।'

জিজ্ঞেস করি, 'মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে আর কেউ নেই বুঝি?'

তিনি মাথা নাড়েন, 'না। তেমন দেখে শুনে পাঁচজনের সংসারে তো আর দিতে পারিনি। ওই একটি ছেলেকে দেখেই দিয়েছিলাম। আর পাঁচজন দেখে দিলেই বা কী হত। সেদিন আর নেই মশাই। দেওর ভাসুর বিধবা ভাইবউকে পুষবে, সেদিন আর নেই। এখন যার যার তার তার। একজন বিহনে সব অন্ধকার। পথের ভিখিরী। আজকালকার মেয়েরা যে নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে, খুব

ভালো মশাই, খুব ভালো। আমি খুব পছন্দ করি। আজকাল কেউ কাউকে দেখতে চায় না, কেউ কারোদিকে তাকায় না। যে যার নিজের পোঁটলা-পুটলি নিয়েই ব্যস্ত। সত্যি কিনা বলুন।'

আমি তর্ক না তুলে মাথা নেড়ে সায় দিই।

তিনি বলতে থাকেন, 'মানুষের সেই সাধ্যই নেই। ভগবান মানুষকে মন বুঝে ধন দেন, নাকি ধনের মাপে মন গড়ে তোলেন তিনিই জানেন। মানুষের সেই শক্তি, মানুষের সেই অন্তরও নেই। সবাই পায়রার খোপের পায়রা।'

আমি তাঁর পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে ফের জিজ্ঞেস করি, আপনার মেয়ে কি কিছু করেন?'

তিনি বলেন, 'কী আর করবে। লেখাপড়া কি কিছু জানে যে তাই ভাঙিয়ে খাবে? চিঠিখানা, পত্তরখানা অবশ্য লিখতে পারে। তা আর পারবে না কেন। নভেল টভেল তো পড়েছে, এখনো পড়ে। খেতে পাক আর না পাক এই এক নেশা। কিন্তু নেশা মানুষকে খায়। তাতো আর মানুষের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করে দেয় না।'

আমি পরামর্শ দিই, 'এখনো তো সুযোগ আছে। এখনো কিছু লেখাপড়া শিখিয়ে, কি কোন হাতের কাজ-টাজ শিখিয়ে ওঁর জীবিকার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। আপনি মেয়েদের স্বাবলম্বন পছন্দ করেন, তাই বলছি। তা ছাড়া ওঁর ভবিষ্যতের কথাও তো ভাবতে হবে।'

তিনি বলেন, 'তা কি আর ভাবিনি? কিন্তু ভেবেও কি কিছু উপায় বার করতে পেরেছি? ভেবেচিন্তেই এক শিল্পাশ্রমে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম। সেখানে গরীবের মেয়েদের বিনা পয়সায় সেলাই-ফোঁড়াই শিখবার ব্যবস্থা আছে। জিনিস-টিনিস যা তৈরি হয়, তারাই বিক্রি করে মেয়েদের দু-চার টাকা দেয়। এস সব শুনে মেয়েকে ছেড়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু ছ মাস যেতে-না-যেতেই মহা কেলেঙ্কারী।'

'কী রকম ?'

তিনি খানিকক্ষণ কোন কথা বললেন না। তারপর হঠাৎ বলে উঠলেন, 'সেকথা আর শুনে কী করবেন মশাই। গরীবের মেয়ের রূপ বড় বালাই।'

একথার পর আমি চুপ করে গিয়েছিলাম। আর কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস করিনি।

খানিকক্ষণ নির্বাক থেকে তিনিই ফের কথা বলেছিলেন, তারপর মেয়েকে আমি ছাড়িয়ে নিয়ে আসি। ছাড়ানো কি সহজ। মেয়ের তবু শিক্ষা হয় না। বছর ঘুরতে না ঘুরতে বলে আমি আবার বেরোব। নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করব। কিন্তু আমি বলেছি —না বাছা, তার আর দরকার নেই। তোমার দুটি পা শুধু খানাখন্দে পড়বার জন্যেই তৈরি হয়েছে। অমন পা বাড়ির বাইরে বাড়াবার আর দরকার নেই। যা করতে হয়, ঘরে বসেই কোরো। আমি যে কদিন আছি, ঘরের মধ্যে থাকো।'

'আপনার স্ত্রী নেই বুঝি ?'

ভদ্রোলোক জবাব দেন, 'সে অনেককাল পার হয়েছে। সে থাকলে কি আর এই দুর্ভোগ হয় ?'

এর পর অনেকদিন কোন পারিবারিক প্রসঙ্গ তিনি আর আমার কাছে তোলেননি। আমিও আর জিজ্ঞেস করিনি। তাঁকে মাঝে মাঝে চুপচাপ থাকতে দেখে আমার মনে হয়েছে, ঝোঁকের মাথায় অত সব কথা বলে ফেলে তিনি বোধহয় লজ্জিত হয়ে পড়েছেন, হয়তো অনুতপ্ত হয়েছেন।

আমি তো চতুর নাগরিকের মত আমার সব গোপন কথা আড়াল করে রেখেছি। এমন কি সাধারণ সুখ-দুঃখের কথাও ওঁকে জানাইনি। অথচ কথায় কথায় আমি ওঁর অনেক কথাই জেনে নিয়েছি। হয়তো সেই কথা ভেবে ওঁর এখন সঙ্কোচ হচ্ছে।

কিন্তু দুদিন যেতে-না-যেতেই ওঁর সঙ্কোচ কাটল। সেদিন

পার্কে দেখা হতেই একগাল হেসে পঞ্চাননবাবু আমাকে বললেন, 'আপনার জন্যে একটা জিনিস এনেছি।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কী ব্যাপার।'

তিনি তাঁর ঝুল পকেট থেকে কাঁচা সবুজ কলাপাতার একটি মোড়ক আমার হাতে তুলে দিলেন।

আমি বললাম, 'কী এর মধ্যে ?'

তিনি হাসলেন। সে-হাসি রহস্যে নিগূঢ়। বললেন, 'দেখুন না খুলে।'

খুলে দেখি একমুঠো শেফালী। ভারি ভালো লাগল। মনে পড়ে গেল ঋতুটি শরৎ। একটি চমৎকার নতুন সকালের স্বাদ গন্ধ বর্ণ ওই শেফালী কটি যেন কোত্থেকে ধরে নিয়ে এল।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় পেলেন ?'

তিনি বললেন, 'আমার নিজের গাছের। দু বছর আগে নিজের হাতে লাগিয়েছিলাম। সেই গাছের ফুল। এই ফুল নিজের ছেলেমেয়ের কাছে তো আর পেলাম না।'

তারপর প্রায় রোজই তিনি আমাকে একমুঠো করে ফুল দিতে লাগলেন।

আমি আপত্তি করে বললাম, 'আহা রোজ কেন দিচ্ছেন।'

তিনি বললেন, 'নিন না মশাই। এতো আর পয়সার কেনা নয়।

কথায় বলে পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে ধর্মগ্রন্থ দিলে পুণ্য। আপনারা কবি মানুষ। আপনাদের ফুল ফল দিলেও সেই পুণ্য লাভ হয়। সবাই কি সব বস্তুর মর্যাদা জানে ? এ-ফুল এখন দেখছেন, এখন গন্ধ খুব সামান্য। এই যদি সন্ধ্যার পর হত গন্ধে পাগল হয়ে যেতেন আপনি। আসুন না একদিন আমার ওখানে। চা খাবেন, আর গাছটা দেখে যাবেন। চমৎকার গাছ হয়েছে। দেখলে চোখ জুড়োয়। কিন্তু নাতিটা হয়েছে রাজার বাঁদর। ও ফুল নেবে, পাতা ছিঁড়বে, ডাল ভাঙবে। পারে তো শিকড়-বাকড় শুদ্ধু গাছটাকে

উপড়ে তুলে নেয়। আসুন না একদিন। নিজের চোখে সব দেখবেন।'

আমি মৃদু হেসে বলি 'যাব।'

পঞ্চাননবাবু অনুযোগ দিলেন, 'আপনি কেবল যাব-যাবই করেন, গেলেন তো না একদিন।'

মনে মনে ভাবলাম, এবার আমার ওঁকে কিছু দেওয়া উচিত। কিন্তু কী দিই। একদিন বাড়িতে চা খেতে ডাকবার কথা ভাবলাম। কিন্তু পথের আলাপকে ঘরে পর্যন্ত টেনে নেওয়ার ঝামেলা অনেক। তবু ওঁকে কিছু দিতে পারলে ভালো হয়।

মানুষের মনের প্রার্থনা দেবতারা তো শোনেনই দেখা গেল, মানুষেও শোনে। কয়েকদিন যেতে-না-যেতেই ভদ্রলোক আমাকে একটু নিরালায় ডেকে নিয়ে বললেন, 'একটা কথা বলব, কিছু যদি মনে না করেন।'

'বলুন না।'

'দশটা টাকা হবে আপনার কাছে? বড় ঠেকে পড়েছি।'

একটু বিব্রত হয়ে বললাম, 'টাকা তো সঙ্গে নিয়ে বেরোইনি। কাল দিলে হবে?'

তিনি বললেন, 'না-না, কাল পর্যন্ত সবুর সইবে না। সংসার এমনই এক আজব অজগর। তার যখন দরকার, তখনই চাই।'

আমি বললাম, 'তাহলে আপনি আসুন আমার সঙ্গে।'

তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে এলেন, কিন্তু কিছুতেই বাড়ির ভিতরে ঢুকলেন না। বললেন, 'না। আজ আর এই ভিখিরীর বেশে যাব না। আর একদিন আসব। সেদিন এসে আপনার এখানে চা খাব, গল্প করব।'

ওঁর এত সঙ্কোচ দেখে টাকাটা আমি প্রায় লুকিয়েই ওঁর হাতে গুঁজে দিলাম।

তিনি বললেন, 'আপনি চিন্তা করবেন না। আমি এক সপ্তাহ বাদেই —।'

আমি বললাম, 'ঠিক আছে। আপনি ও নিয়ে ভাববেন না।'

এক সপ্তাহের জায়গায় এক মাস হয়ে গেল। পঞ্চাননবাবুর সঙ্গে রোজ নয়, মাঝে মাঝে দেখা হয়। আর আলাপের শুরুতেই তিনি বলেন, 'দেখুন, আপনার কাছে আমি বড় লজ্জিত হয়ে আছি।'

আমি বলি, 'না না, লজ্জার কী আছে।'

কিন্তু তিনি যখন এই লজ্জা ঘনঘনই জানাতে লাগলেন, ঋণের কথাটাও বারবার বলতে লাগলেন, অথচ ঋণশোধ দেওয়ার কোন লক্ষণই দেখলাম না, আমি ভিতরে ভিতরে বিরক্ত হলাম। টাকাটা তিনি শোধ দিতে পারবেন না কি দেবেন না, তা আমি বুঝে নিয়েছি। কিন্তু সে কথা বারবার মনে করিয়ে দেওয়া কেন?

দেখা হলেই ভদ্রলোক একইভাবে শুরু করেন, 'আপনার কাছে ঋণীই রয়ে গেলাম। জানিনে কবে শোধ দিতে পারব। এমনই পাকে জড়িয়ে পড়েছি।'

আমি অন্য কথা পাড়ি কি কোন কথা না বলে চুপ করে যাই। আমরা সবাই কোন না কোন ভাবে একই সঙ্গে উত্তমর্ণ আর অধমর্ণ। কারো কাছে মনিব, কারো কাছে দাস। কিন্তু রাত পোহালে পাওনাদারের মুখ যেমন আমরা দেখতে চাইনে, তেমনি দেনাদারের মুখও নয়নাভিরাম মনে করিনে। বিশেষ করে সে দেনাদার যদি শুধুই বিনয় আর কৃতজ্ঞতার আধার হয়, দেনাশোধের বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করে।

আমি ইচ্ছা করেই ওঁকে এড়িয়ে যাই। তিনিও যে এড়াতে চান তা বুঝতে পারি। আগে আমরা দুজনে দুদিকে মুখ করে হাঁটতাম। মুখোমুখি হবার পর তিনি দিক পরিবর্তন করে আমার সঙ্গে আসতেন। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে কথা বলতেন। আজকাল আর তা হয়

না। আজকাল আর আমি তাঁর মুখ দেখিনে। কাঁধ দেখি, ঘাড় দেখি, পিঠ দেখি। কোন কোন দিন কিছুই দেখিনে।

অবস্থা দেখে আমার আর একজন প্রতিবেশী ভ্রমণবিলাসী বন্ধু আমাকে বললেন, 'কী হয়েছে আপনাদের?'

হেসে বললাম, 'কী আবার হবে?'

'দে মশাইকে কত টাকা দিয়েছেন?'

'আপনি জানলেন কী করে?'

'আমি জানি। ওঁর ওই ব্যবসা। আরো দু'একটা অন্যরকম ফন্দি ফিকিরও আছে। এ পাড়ার অনেকেই জানেন। আপনিই শুধু জানতেন না। কত দিয়েছিলেন?'

সংখ্যাটা আমি বন্ধুকে বললাম।

তিনি বললেন, 'তবু ভালো। দশের ওপর দিয়েই গেছে। আরো যেতে পারত।'

মনটা খারাপ হয়ে গেল।

দিন কয়েক দূরে দূরে থেকে পঞ্চাননবাবু ফের ঘনিষ্ঠতা শুরু করলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাঁটলেন। ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের কথা ভুলে গিয়ে আবার সেই সমাজ রাজনীতি, শিক্ষাব্যবস্থায় অসঙ্গতি, আদর্শ থেকে স্খলন পতনের কথা নিয়ে বক্তৃতা শুরু করলেন। আমি ভাবলাম এও মন্দের ভালো।

কিন্তু আমার ভাগ্য তত ভাল নয়। তিনি আর একদিন আমাকে একান্তে ডেকে বললেন, 'দেখুন আপনার টাকাটা এখনো দিতে পারিনি। কিন্তু ভাববেন না আমি ফাঁকি দিয়ে পালাব। নিশ্চয়ই দেব। সব বেচে দিলেও দেব। কিন্তু আজ আমাকে পাঁচটা টাকা দিতেই হবে। নাতিটার জ্বর। ডাক্তার দেখাতে পারছিনে। আর বলবেন না। এমন ভূতের ব্যাগারের দায়েই পড়েছি। পকেটে আছে? না কি আপনার সঙ্গে আসব?

আমি এক মুহূর্ত গম্ভীরভাবে থেকে বললাম, 'অসম্ভব। আমার আর দেওয়ার সাধ্য নেই দে মশাই।'

তিনি খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে বললেন, 'অন্তত দুটি টাকা?'

আমি ফের আমার অসামর্থ্যের কথা জানালাম। তিনি বললেন, 'কিন্তু আমি বড়ই বিপদে পড়েছি। আমার কাছে তো আর কিছু নেই। আপনি আমার এই খাপশুদ্ধ চশমাটা রাখুন। রেখে দুটি টাকা আমাকে দিন।'

আমি চটে উঠে বললাম, 'আপনি ভুল করেছেন দে মশাই। বন্ধকীর ব্যবসা আমার নয়, তাহলে সত্যিই বড়লোক হতে পারতাম।'

তাঁর পাশ কাটিয়ে, হাত এড়িয়ে কোনরকমে পার্ক থেকে বেরিয়ে এলাম।

কী সাংঘাতিক মানুষ। চোখের চশমাটা বাঁধা রাখতে চাইছে। এ বোধ হয় নাক কান চোখও বাঁধা রাখার প্রস্তাব করতে পারে।

দিনকয়েক পঞ্চাননবাবুকে আর দেখলাম না। তারপর ফের একদিন ওঁর সঙ্গে দেখা হল। তিনিই পিছন থেকে ছুটতে ছুটতে এসে আমাকে ধরলেন। হেসে বললেন, 'এই যে আপনি। আপনার সংকোচের কারণ নেই মশাই। আমি আর এক জায়গা থেকে ম্যানেজ করে নিয়েছি। নিন আপনার জন্যে নিয়ে এসেছি। আপনাকে এই জন্যই খুঁজছিলাম।'

তিনি পকেট থেকে হাত বার করলেন। আমি অবাক হয়ে দেখলাম, না দশ টাকার নোট নয়, পাঁচ টাকারও নয়, তার বদলে গুটি চারপাঁচ শেফালী ফুল।

পঞ্চাননবাবু হেসে বললেন, 'নিন মশাই। আমার গাছের শেষ ফুল। শ্রাবণ থেকে শুরু হয়। কিন্তু অঘ্রাণ পড়তে না পড়তেই বন্ধ হয়ে যায়। গাছটার ওই এক ধরন। নিন।'

আমি হাতটা টেনে নিয়ে বললাম, 'না থাক।'

ভদ্রলোক স্তব্ধ বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর আস্তে আস্তে

বললেন, 'টাকাটা আমি দিতে পারিনি, আপনি আমার ওপর রাগ করে রয়েছেন। কিন্তু ফুল কটা যদি নিতেন—। ফুল তো আর সুদ হয় না, কিন্তু সুদ ভেবেই না হয় নিতেন। আমার গাছের শেষ ফুল। ফুল তো আপনি ভালোবাসেন।'

তিনি চলে যাওয়ার পর আমার খেয়াল হল। ভাবলাম ওঁকে একবার ডাকি। কিন্তু ডাকতে পারলাম না। ভাবলাম বুড়ো ভদ্রলোকের কাছ থেকে ফুল কটি চেয়ে নিই।

কিন্তু নিতে পারলাম না।

কোন কোন সময় গ্রহণ মানেই দান।

কিন্তু এমন এক এক সময় আসে যখন আমরা নিতেও পারিনে দিতেও পারিনে।

॥ গ্রন্থি ॥

বাড়ির কর্তা সুবিমল গুপ্ত সেদিন তার ছেলে ছান্নুর কাছে বড় লজ্জিত হল। দুটো আলমারির বই, র‍্যাকগুলির বই সব এলোমেলো অগোছালো হয়ে আছে। কোন কোন তাকে হয়তো মাকড়সা জাল বুনেছে। ছান্নুর মা অনীতারও স্কুলে মাস্টারি আছে, সংসার আছে, কিন্তু বই গুছাবার এখন আর সময় নেই, অন্তত আগের মত নেই। তাই দাম্পত্য কলহের ঝুঁকি না নিয়ে সুবিমল ছান্নুকেই বকুনি লাগাল। বইগুলির দশা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, 'দেখ তো কী হয়েছে অবস্থাটা। এ সব কি আমি দেখব না তোরা দেখবি? তোরা এখন বড় হয়েছিস, কলেজে পড়ছিস, বইয়ের ওপর তোদের আলাদা দরদ থাকবে। তা তো নয়—।'

ছান্নু বেশ বাধ্য ছেলে। আড়ালে মা আর বোনের কাছে বাবার যত সমালোচনাই করুক, সামনে কিছু বলে না।

বাবার বকুনি ছান্নু মাথা নিচু করে সব শুনে গেল। সুবিমলের সন্দেহ হল ও যেন মুখ মুচকে একটু হাসছেও। হয়তো হাসবে বলেই মাথা নিচু করেছে। কাউকে কাউকে রাগলে ভয়ঙ্কর দেখায়, কাউকে বা হাস্যকর। সুবিমল কি দ্বিতীয় শ্রেণীর? ছান্নুর মা তো তাই বলে।

নিজের পড়বার ঘরে চলে যাবার আগে ছান্নু বলল, 'বাবা, আজ আমার দুটোয় ছুটি হয়ে যাবে। ফিরে এসে রুনুকে নিয়ে সব বই আমি গুছিয়ে রাখব।'

অনীতা স্কুল থেকে ফিরে এসে স্বামীর রাগারাগির খবর শুনে বলল, 'অত রাগের কি হয়েছে? যাঁর বই, তিনি একটু মাঝে মাঝে

ঝাড়পোঁছ করলেই পারেন। আর কিছুই তো করেন না, কুটো-গাছটাও নাড়েন না। এ তো আর তৃণকুটো না, বাজারের থলি-টলিও না। হাত দিয়ে ছুঁলে তাঁর জাত যাবে না।'

এসব পরোক্ষ উক্তির প্রত্যক্ষ জবাব দিতে গেলে অফিসে লেট হতে হবে। তাই খেয়েদেয়ে সুবিমল নীরবেই বেরিয়ে গিয়েছিল।

অফিস থেকে ফিরে এসে দেখে তাজ্জব কাণ্ড। বসবার ঘরখানা একেবারে ঝকঝক তকতক করছে। আলমারিতে খোলা র‍্যাকগুলিতে দেয়ালের উঁচু তাকে সব বই একেবারে সুবিন্যস্ত।

অনীতা একটু হেসে বলল, 'তোমার ছানুই সব করেছে।'

ছানু বলল, 'না বাবা। মা আর রুনু গুছিয়েছে বইগুলো। তবে আমি একটা একসারসাইজ খাতা কিনে ভালো করে লিস্ট তৈরী করেছি। আর একখানা খাতা তৈরী করেছি। যে যখন বই নেবে তার নাম আর বইয়ের নাম ওই খাতাটায় লিখে রাখব।'

খাবার ঘরের টেবিলে গিয়ে সবাই মিলে চা খেতে বসল।

সুবিমল মেয়ের দিকে চেয়ে হেসে বলল, 'বেশ তো, রুনুকে লাইব্রেরিয়ান করে দেওয়া যাবে।'

রুনু ক্লাস নাইনে পড়ে। মাঝে মাঝে ফ্রক ছেড়ে মায়ের শাড়ি পরে অনীতার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ সাজে। কথায় বার্তায় বেশ চটপট। রুনু বলল, 'বাবা, আমাকে তাহলে মাইনে দিতে হবে কিন্তু।'

সুবিমল হেসে বলল, 'আচ্ছা, মাসে মাসে এক টাকা করে পাবি।'

'মোটে! তা হবে না বাবা। অন্তত পক্ষে দশ টাকা করে—'

সুবিমল ছেলের দিকে চেয়ে বলল, 'এই বুদ্ধিটা তোমার যদি কিছু দিন আগে হত ছানু অনেক বই রক্ষা পেত। আমার কত বই যে হারিয়েছে, চুরি গেছে, পড়তে নিয়ে বন্ধুরা আর ফেরত দেয় নি। এখন আবার তোমার বন্ধুরা জুটেছে। তুই দরাজ হাতে যে সব বই ওদের দিস তার সব ফেরত আসে কি না একটু খেয়াল রাখিস তো।'

এই কথার পিঠেই ছান্নু হঠাৎ বলে ফেলল, 'বাবা, তোমার আলমারিতে কিন্তু পাঁচ-সাতখানা অন্যের নাম লেখা বই আছে।'

খেতে খেতে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল সুবিমল। কেউ কোন কথা বলছে না। না অনীতা, না রুনু। পুলিসের হাতে চোর ধরা পড়লে সবাই যেমন মজা দেখে ওরাও যেন তাই দেখছে।

একটু বাদে সুবিমল বলল, 'হতে পারে। কলেজ ষ্ট্রীটের ফুটপাত থেকে অনেক পুরোন বই তো কিনেছি। সে সব বইয়ে তাদের পুরোন মালিকের নাম লেখা আছে।'

ছান্নু বলল, 'না বাবা, শুধু তাই নয়। কয়েকখানা বইতে তোমার বন্ধুদের নাম লেখা। দুখানা মেজো মামা আর একখানা মেসোমশাইর বইও আমাদের আলমারিতে রয়ে গেছে। এগুলি আমি খাতায় তুলি নি। আলাদা করে বাইরে রেখে দিয়েছি।

এ তো ছেলে নয় যেন জাঁদরেল পুলিস ইনস্পেক্টর। কে বলবে ছান্নু ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে, মাত্র পনের ষোল বছর ওর বয়স। সুবিমলের সামনে পুত্ররূপী যেন দণ্ডধর, নীতিবাদী, নির্মম এক পুরুষপ্রধান বসে রয়েছেন।

আসামীকে উদ্ধার করবার জন্যে এবার অনীতা মুখ খুলল, 'তাতে আর কী হয়েছে। পড়তে এনেছিলেন, ভুলে আর ফেরত দেওয়া হয় নি। ফিরিয়ে দিয়ে এলেই হবে। সেই ভালো। নইলে আবার কে কোত্থেকে নিয়ে যাবে। আমাদের বইও তো কম হারায় না।'

কিন্তু স্বামীর পক্ষ টেনে যত কথাই বলুক, সওয়াল জবাবে যত নৈপুণ্যই দেখাক, জজের কাছে বেকসুর খালাস তো দূরের কথা, আসামী যে বেনিফিট অব ডাউটও পেল না তা বুঝতে বাকি রইল না সুবিমলের।

খাওয়া-দাওয়ার পর সেই দিন রাত্রে নিজের গ্রন্থসংগ্রহ নেড়েচেড়ে খুলে খুলে দেখতে লাগল সুবিমল। নিজের এই গ্রন্থশালা

যেন তার এক ধরনের আত্মজীবনী। বইগুলি যেন তার রুচি শিক্ষা সাধ্য আর সামর্থের নিদর্শন। কত ছোট ছোট ঘটনা, সুখদুঃখের স্মৃতি এই বইগুলির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এমন অনেক বই রয়েছে যেগুলি সে বার বার পড়েছে, পড়ে আনন্দ পেয়েছে আবার এমন অনেক বইও আছে যেগুলি সে ছুঁয়েও দেখেনি। শুধু জমাবার নেশায় জমিয়েছে, কিনবার নেশায় কিনে রেখেছে। ক্রীত বই আছে, উপহৃত বই আছে, কয়েকখানা অপহৃত বইও ছেলের হাতে আজ আবিষ্কৃত হল।

শহরতলীতে ফ্ল্যাট বাড়ি। দুখানি ঘরের একটি ফ্ল্যাট নিয়েছে সুবিমল। এরই ভাড়া একশ টাকা। ও ঘরে অনীতা থাকে ছেলে-মেয়ে নিয়ে। আর দিনের বসবার ঘরকে, বসে বসে পড়বার ঘরকে রাত্রের শোবার ঘর করে সুবিমল, শুয়ে শুয়ে পড়বার ঘর করে। মাঝখানে দরজা খোলা থাকে। গভীর রাত্রে ছেলেমেয়েরা ঘুমুলে ও ঘরের জননী এ ঘরে এসে প্রিয়া হয়। আজও তাই হল। অনীতা এল স্বামীর মশারি গুঁজে দিতে।

অনীতা বলল, 'তুমি ঘুমোওনি? কী অত ভাবছ বল তো।'

সুবিমল বলল, 'কী আবার ভাবব?'

অনীতা বলল, 'দেখো, আমার কাছে লুকিয়ো না। তখন ছানু কী বলেছে না বলেছে তারপর থেকে তুমি একেবারে মুখখানাকে হাঁড়ি করে রেখেছ। একেক সময়ে তুমি যে কত কী বলো, কত গোলমাল কর, কত খোঁটা দাও আমাদের, আমরা তোমার মত অমন করে থাকি নাকি?'

সুবিমল বলল, 'আরে না না। যত সব বাজে কথা। ওসব ছেড়ে দাও।'

খানিক বাদে অনীতা বলল, 'যাই, ঘুম পাচ্ছে। অনর্থক তোমার বইগুলি আজ ঘাঁটাঘাঁটি করে মরলাম।'

সুবিমল হেসে বলল, 'অনর্থক কেন।' তারপর স্ত্রীকে একটু

আদর করল। ভাষণ-সম্ভাষণ-প্রতিভাষণের পালা চলল কিছুক্ষণ।

অনীতা ফিরে গেল।

এরপর সুবিমলের ঘুমিয়ে পড়বার কথা। কিন্তু ঘুম এল না। ফের মনে পড়ল ছানুকে। বইগুলি যদি ফেরত দিতে দেরি করে, ছানু তার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকাবে। মুখে হয়তো কিছু আর বলবে না। কিন্তু ভেবে রাখবে তার বাবা কী। এতেই ছেলের কাছে সে অনেকখানি ছোট হয়ে গেছে। যত দিন যাবে, ছানু যত বড় হবে, সুবিমল ওর চোখে তত ছোট হবে, যতক্ষণ না চল্লিশ পার হয়ে ছানু নিজে সিনিক হয়ে যায়। সুবিমল হাসল, 'আমরা যতদিন বালক থাকি কিশোর থাকি, শুধু ততদিনই প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগের কাছাকাছি থাকি। পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলে চুরি করা হয়। কদাচ মিথ্যা বলিও না—এই সব অনুশাসনে বিশ্বাস করি। তারপর পরের শাসনের সঙ্গে আমরা আত্মস্নেহকে মিশাই। যেন মাতৃস্নেহ। আমরা সত্যও বলি, মিথ্যাও বলি, ন্যায়ও করি, অন্যায়ও করি আর তারই ভিতর দিয়ে আমাদের জীবন সমাপ্তির দিকে এগিয়ে চলে। এক-একটি বৃত্ত শেষ হয়। বয়স হয়ে গেলে শুধু প্রথমভাগ দ্বিতীয়-ভাগের মধ্যে আমরা আর আবদ্ধ থাকতে পারিনে, আমরা আরো বিভক্ত হই। ভগ্নাংশ থেকে ভগ্নাংশে খণ্ডিত, টুকরোয় টুকরোয় ছিন্নবিচ্ছিন্ন হতে থাকি। আমরা বড় রকমের অপরাধ কিছু করিনে, করতে পারিনে। কিন্তু প্রতিদিনের আচার আচরণে আমাদের জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে ছোট ছোট ত্রুটিবিচ্যুতি পাথরের কুচির মত জমতে থাকে। ছলনা বঞ্চনা, ঈর্ষ্যা অসূয়া বিদ্বেষের টুকরোয় আমাদের পিঠের বোঝা ক্রমাগত ভারি হয়ে ওঠে। শেষে একদিন মনে হয় ওই বোঝাও যা জীবনও তাই।' সুবিমল ভাবতে লাগল। ঘুমোবার আগে ঠিক করল কাল রবিবার আছে। কালই যত দূর সম্ভব বইগুলি ফেরত দিয়ে আসবে। আত্মীয়-কুটুম্বের যে কখানা বই আছে ছানু রুনু কি ওদের মাকে দিয়ে ফেরত পাঠাতে হবে। আর বন্ধুদের

বইগুলি অবশ্য নিজের নিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। তার মধ্যে 'আনা কারেনিনা' খানা স্থরেন মৈত্রকে আর ফেরত দেওয়া যাবে না। সে ইহলোক ত্যাগ করেছে অনেক দিন। তার আত্মীয়-স্বজন কে কোথায় আছে স্থবিমল জানে না। Conquest of Happiness খানা উষা ভট্টাচার্যের। সে দিল্লীতে বড় অফিসারের গৃহিণী। অন্য ফ্রণ্ট থেকে আক্রমণ চালিয়ে সে হয়তো স্থখকে এতদিনে জয় করেছে। বইটা সত্যিই তাকে ভুলে ফেরত দেওয়া হয় নি। এবার ডাকে পাঠিয়ে দিলেই হবে। কিন্তু শেক্সপীয়রের গ্রন্থাবলীর আড়াই টাকা দামের ওই স্থলভ সংস্করণটি যে বন্ধুর সেই প্রশান্ত অধিকারী এই কলকাতাতেই থাকে। নানা ঘাটে ঘুরে ঘুরে এখন বেলেঘাটায় বাসা বেঁধে রয়েছে। তাকে বইখানি ফেরত দিয়ে আসা যায়। যায় কিন্তু বড় কঠিন। বিশ বছর পরে তার সম্পত্তি বগলে করে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে, হাসিমুখে বলতে হবে, 'ভাই, ভুলে তোমার বইখানা আমার কাছে ছিল। আজ নিয়ে এসেছি। বিশ বছরের ভুল শোধ করতে এসেছি আজ।'

ভাবা যত সহজ, বলা ততই কঠিন।

প্রশান্ত নিশ্চয়ই অবাক হবে! মনে মনে হাসবে।

কিন্তু শেক্সপীয়রের অমূল্য রচনাবলীর এই অল্পমূল্য সংস্করণটিতে তার আর কোন দরকারও নেই। ওই ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষর সে আর পড়তে পারে না। পনের টাকা ব্যয় করে আর একটি ভালো এডিশন সে কিনে নিয়েছে। কতদিন ভেবেছে কোন না কোন ছলে বইখানি ফেরত দিয়ে আসবে। কিন্তু দেওয়া আর হয়ে ওঠেনি। অনেক সদিচ্ছাই যেমন নদীর ছোট ছোট ঢেউয়ের মত ওঠে আর মিলায়, এই ইচ্ছাটিও তেমনি মিলিয়ে গেছে।

কিন্তু এবার আর মিলিয়ে যেতে দিল না স্থবিমল। ভোরে উঠে চা-টা খেয়ে স্ত্রীকে বলল, 'আমি একটু বেলেঘাটা থেকে ঘুরে আসি।'

অনীতা বলল, 'সে কি। তুমি না আজ নিজের হাতে বাজার

করবে বলেছিলে? তা বুঝি ভুলে গেছ। অন্য দিন তো ঝিতেই করে।'

সুবিমল বলল, 'আজ তোমার সত্যবান ছেলেকেই বাজারে পাঠাও।'

অনীতা হেসে বলল, 'বাব্‌বা! সেই কালকের আক্রোশ মনের মধ্যে আজও পুষে রেখেছ। তুমি কী।'

সুবিমল শেক্সপীয়রকে কালকের বাসি খবরের কাগজের পাতায় মুড়ল। তারপর দোতলা বাসে চেপে চলল বন্ধুসন্নিধানে। শহরের এক তলি থেকে আর এক তলিতে।

বন্ধু। এক সময় খুবই বন্ধুত্ব ছিল প্রশান্তের সঙ্গে। এক কলেজে পড়েছে, একই অফিসে কয়েক বছর কাজও করেছে। এক সঙ্গে থিয়েটার সিনেমা দেখেছে। একই লেখকের লেখা উপভোগ করেছে আবার মতভেদ হলে ঘোরতর তর্ক-বিতর্কও করেছে, একজন আর একজনকে অরসিক বলে প্রমাণ করতে বাকি রাখেনি। তবু বন্ধুত্ব ছিঁড়ে যায় নি। যৌন জীবনের আলোচনায় পরস্পরের অভিজ্ঞতার বর্ণনায় আবার তা রসঘন হয়ে উঠেছে। প্রশান্ত বলত, 'দেখো, নিষ্কাম প্রেমে যেমন আমার বিশ্বাস নেই, কলুষঢাকা বন্ধুত্বেও তেমনি ঘোর অনাস্থা। আমরা একজনের কাছে আর একজন অকপট হব, সব খুলে বলব এই হল বন্ধুত্বের প্রধান শর্ত।'

সুবিমল বলত, 'বন্ধুত্বের কোন শর্ত নেই। চুক্তি করে বন্ধুত্ব হয় না, যুক্তি দিয়েও বন্ধুত্ব হয় না। বন্ধুত্ব হল এক ধরনের প্যাশন। যে প্যাশন নিয়ে আমি একটি মেয়েকে ভালোবাসি সেই প্যাশন নিয়ে আমি তোমাকেও ভালোবাসি And that passion is unaccountable.'

বন্ধুত্ব নিয়েও তারা কত তত্ত্বের আলোচনাই না করেছে।

সুবিমল জানলার ধারের একটি সীটে একান্তে বসে ভাবতে ভাবতে চলল, 'সবচেয়ে দুঃখ এই সেই প্যাশনের বড় তাড়াতাড়ি মৃত্যু হয়।

লোকান্তর হয়, ক্ষেত্রান্তর হয়, রূপান্তর হয়। প্যাশন unaccountable বলেই বোধ হয় unreliable, unsurvivable, নীতিবাদীর মতে undesirable। সবচেয়ে দুঃখ বন্ধুত্ব বড় ক্ষীণায়ু, ক্ষণায়ু। আমরা জানি না কিসে তার আয়ুবৃদ্ধি হয়, জলে আলোয় কী করে সেই চারাগাছকে বাড়াতে হয়, কী করে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হয় আমরা জানিনে। এই দুর্লভ দুর্মূল্য পরম বস্তুকে আমরা তাই পাই আর হারাই, পাই আর হারাই—শেষে আর পাইনে।'

সুবিমল তার সমবয়সী অনেক ভদ্রলোককে আজকাল বলতে শোনে 'আমার কোন বন্ধু নেই।' প্রশান্তকেও সুবিমল হারিয়েছে। একখানা বইয়ের জন্যেই কি? এই আড়াই টাকা দামের একখানা বইয়ের জন্যে? কিন্তু যার এক পয়সার ক্ষতিও করেনি এমন বন্ধুর সঙ্গেও তো বন্ধুত্ব নেই সুবিমলের। সেই প্রচণ্ড প্যাশন সাধারণ পরিচয়ে এসে তার মহিমা হারিয়েছে, প্রেম যেমন শান্তির সমাধিতে পোষ মানে দৈনন্দিন দাম্পত্য শয্যায়।

প্রশান্তকে হারিয়েছে সুবিমল। একই ডালহৌসী স্কোয়ারে তাদের অফিস। প্রশান্ত আছে সরকারী বীমা কর্পোরেশনে। জীবন এখন শুধু সীমায় এসে ঠেকেছে। আর সুবিমল চালায় বেসরকারী প্রচারকার্য। ঢাক পিটিয়ে পিটিয়ে কী করে নিরেস বস্তুকে সরেস, নীরস না হোক ভেজাল রসকে বিশুদ্ধ অমৃতরস বলে চালানো যায় তারই চিন্তায় চেষ্টায় প্রতিযোগিতায়। প্রশান্তের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ মাঝে মাঝে হয়। নিজের পলিসির প্রিমিয়াম দেবার সময় সুবিমল গিয়ে হাজির হয় ওর অফিসে। প্রশান্ত সুবিমলকে সাহায্য করে, সুবিমল প্রশান্তের সিগারেটের টিন খুলে ধরে। প্রশান্ত বলে, 'যেয়ো একদিন।' সুবিমল বলে, 'তুমিই এসো না।'

কেউ যায় না, কেউ আসেও না। এই কি সেই বন্ধুত্ব?

সুবিমল আজও বাসে যেতে যেতে ভাবল, 'সেই প্রশান্ত আর নেই। সেই সুবিমলও আর নেই। তবু চাই সেই বন্ধুত্ব থাকুক।'

শিয়ালদা এসে বাস বদলাতে হল। পঁয়ত্রিশ নম্বরে উঠবার আগে হঠাৎ দু-টাকার লেবু কিনে বসল সুবিমল। বড় ঠোঙাটা তার রঙীন রুমালে দোকানীই বেঁধে দিল তার অনুরোধে।

জোড়া মন্দিরের কাছে গলির মধ্যে বাসা। কোনদিন এ বাসায় আসেনি সুবিমল। প্রশান্তই কি গেছে কোনদিন তার বেলগাছিয়ার ফ্লাটে ?

নম্বর ভুলে গিয়েছিল। জিজ্ঞাসা করে করে গলির মধ্যে প্রশান্তের বাড়ি আবিষ্কার করল সুবিমল। পুরোন দোতলা বাড়িটির সামনে দাঁড়িয়ে রাস্তার ধারের ঘরখানার কড়া নাড়তে লাগল সুবিমল।

একটু বাদেই দরজা খুলল। প্রশান্ত নিজেই এসে দোর খুলে দিয়েছে। খালি গা।

'আরে তুমি, এসো এসো। এতকাল বাদে তোমার আসবার কথা মনে হল ?'

প্রশান্ত তাকে ভিতরে নিয়ে গেল। 'তোমার হাতে এ সব পোঁটলা-পুঁটলি কী বল তো ? তুমি চিরকালই সৌখীন মানুষ, দয়া করে নিজের জীবনের ভারটা বয়ে চলেছ। আর কোন ভার তো তোমাকে এ পর্যন্ত বইতে দেখিনি। এসব কি ?'

সুবিমল বলল, 'ছেলেমেয়েদের জন্য কয়েকটা লেবু নিয়ে এসেছি।'

'এই দেখ, আবার লেবু কেন আনলে ? এই কি লেবুর সময় ? এখনকার লেবু টক হবে। কটা করে এনেছ ? তোমাকে নিশ্চয়ই ঠকিয়ে দিয়েছে। তুমি তো আবার দরদাম করতে পারো না। আর ওখানা কী ? কাগজ দিয়ে মুড়ে এনেছ ?'

'বলছি।'

ঘরের মধ্যে চেয়ারও আছে, তক্তপোশও আছে। সুবিমল তক্তপোশেই উঠে বসল। একবার চোখ বুলিয়ে নিল ঘরখানায়। প্রশান্ত র‍্যাকে আর তাকেই বই রেখেছে। আলমারি করেনি। বইয়ের সংখ্যা বেশি নয়। যা আছে তাও খুব আদর-যত্নে নেই।

প্রশান্তকে বেশ বয়স্ক মনে হয়। চুলটা বেশি পেকে গেছে। কিন্তু চুলদাড়ির চেয়েও বেশি পেকেছে বুকের লোম। সুবিমল বলল, 'তোমাকে অনেকদিন খালি গায়ে দেখিনি। চেহারা এত খারাপ হয়েছে কেন?'

প্রশান্ত বলল, 'আর বলো না। অম্ল তিক্ত কষায়—সেই অম্লটি এতদিনে ধরেছে। জীবনটাকে একেবারে তিক্ত আর কষায় করে দিয়ে ছাড়বে। তাছাড়া ঝামেলা ঝক্কি লেগেই আছে। ছেলেটি পাশ করতে পারেনি। অত ধার দেনা করে মেয়েটির বিয়ে দিলাম—তুমি তো আসতেই পারলে না—এখন শুনতে পাচ্ছি জামাইয়ের স্বভাব-চরিত্র নাকি সুবিধের নয়। মেয়ের মুখের দিকে আর তাকাতে পারিনে ভাই।'

সুবিমল ধমক দিয়ে বলল, 'না তাকাবার কী হয়েছে? বনিবনাও না হয় ছেড়ে চলে আসবে। এবার আর তুমি দয়া করে বিয়ে দিতে যেয়ো না। সে নিজেই নিজের ব্যবস্থা করে নেবে।'

'কী যে বলো।'

সুবিমল এবার জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার স্ত্রী কোথায়?'

প্রশান্ত বলল, 'আর বলো কেন, হাসপাতালে।'

সুবিমল ফের এক ধমক দিল, 'তুমি তো আচ্ছা আহাম্মক। এখনো ওসব পর্ব শেষ করতে পারোনি?'

প্রশান্ত লজ্জিত হয়ে বলল, 'আর বলো কেন। দাঁড়াও, একটু চায়ের ব্যবস্থা করে আসি।'

অন্দরে যাবার দরজা একটু ফাঁক করতেই ছেলেমেয়েদের কান্না, একটি প্রৌঢ়া মহিলার গলার বাঁজখাই আওয়াজের ব্যাক গ্রাউণ্ড মিউজিক ভেসে এল। বোধ হয় ওর শাশুড়ী-টাশুড়ী কেউ হবেন।

সুবিমল হাসল। প্রশান্ত অল্প বয়সে বিয়ে করেছিল। তার সঙ্গে ব্যালান্স রেখে বেশি বয়স অবধি জনক হয়ে চলেছে। সুবিমলের মনে হয় সেই প্রশান্ত আর নেই। তার সেই বন্ধু প্রশান্ত মরে শুধু

ভূত হয়নি, অষ্টাদশ শতাব্দীর ঠাকুরদাদা হয়ে ফিরে এসেছে। এই প্রশান্তকে যদি সে রোজও দেখত তা হলেও একে ভালোবাসতে পারত না, ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখা কঠিন হত।

কোচার খুঁট গায়ে জড়িয়ে প্রশান্ত ফিরে এল। হেসে বলল, 'চায়ের কথা বলে এলাম। তারপর তোমার খবর কি বলো।' সুবিমল এবার শেক্সপীয়রের গা থেকে কাগজের আবরণ খুলে ফেলল। তারপর হেসে বলল, 'প্রশান্ত তোমার এই বইখানা আমার কাছে ছিল। বিশ বছর ধরেই ছিল। ভাবলাম আর বিশ বছর আমরা না-ও বাঁচতে পারি। তার আগে তোমার বইখানা তোমাকে ফেরত দিয়ে যাই। প্রশান্ত, তোমার বই আমি চুরি করে রেখেছিলাম ভাই।'

এই মুহূর্তে সব কিছু যেন স্তব্ধ হয়ে রইল। সুবিমল লক্ষ্য করল প্রশান্তের মুখের ভাব বদলে গেছে, চোখের রঙ অন্য রকম হয়েছে। যেন সেই যুবক অসহিষ্ণু উদ্ধত প্রশান্তকে ফের চোখের সামনে দেখতে পেল সুবিমল। অমন করে কী দেখছে প্রশান্ত? ব্যাঙ্কোর চোখে ম্যাকবেথকে দেখছে নাকি? না, ম্যাকবেথের চোখে ব্যাঙ্কোর ভূতকে? বিশ বছর ধরে একটি মানুষের ছলনা বঞ্চনা কপটতার সব চিত্রই কি ওর চোখের সামনে ভেসে উঠেছে? প্রশান্ত এই বইয়ের খোঁজ কয়েকবার করেছিল, কিন্তু সুবিমল বারবার বলেছে, 'তুমি ভুল করছ, বইখানা আমার কাছে নেই। যে কয়েকখানা ছিল, ফেরত দিয়ে এসেছি।'

খানিক বাদে প্রশান্ত ফের হাসল, বলল, 'আমি জানতাম সুবিমল, জানতাম বইখানা তোমার কাছে নিরাপদে আছে। জানতাম, কিন্তু বড় কষ্ট হত। প্রথম প্রথম অসহ্য যন্ত্রণা হত। নিজের স্ত্রীকে কি ভালোবাসার মেয়েকে কেউ যদি লুকিয়ে রাখে, তাতে যেমন কষ্ট হয় কয়েক বছর আমি সেই কষ্ট পেয়েছি। তারপর লোকে যেমন সব কষ্টই ভোলে আমিও তেমনি আস্তে আস্তে সব ভুলেছি। আরে, তুমি যে আমার বউকেই গাপ করে রাখোনি সেই তো বাঁচোয়া। এখনই

না হয় বাড়ি আর হাসপাতাল করতে করতে বুড়ী হয়ে গিয়েছে। গোড়ায় তো বেশ সুন্দরীই ছিল।' . প্রশান্ত হেসে উঠল।

'কিছু মনে কোরো না ভাই। ঠাট্টা করছি তোমাকে। ঠাট্টা-তামাশার সম্পর্ক তো উঠেই গেছে। তারপর আমি আরো একখানা শেক্সপীয়ার কিনেছিলাম। সেখানাও গেছে। কত বই যে নষ্ট হয়েছে তার আর ঠিক নেই। এখন আর তা নিয়ে শোক দুঃখও নেই। বইয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্কই ভারি!'

সুবিমল বলল, 'তোমার বইখানা তুমি তা হলে রেখে দাও প্রশান্ত।'

প্রশান্ত কী যেন একটু ভাবল। তারপর বলল, 'রেখে দেব? আচ্ছা, তুমি যখন নিয়ে এসেছ তোমার অনুরোধ রাখব। কিন্তু আমার একটা অনুরোধও তোমাকে রাখতে হবে।'

তারপর পট করে পকেটমারের মত সুবিমলের বুক পকেট থেকে তার দামি কলমটা তুলে নিল প্রশান্ত। বন্ধুর হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, 'লেখ তো। লিখে দাও।'

সুবিমল অবাক হয়ে বলল, 'কী লিখব?'

প্রশান্ত বলল, 'লেখ Presented to Prasanta Adhikari, তলায় তোমার নাম আর তারিখ বসিয়ে দাও। সুবিমল, কতদিন আমরা কেউ কাউকে বই দিতে পারিনে, কিছুই দিতে পারিনে। মনে আছে তোমার? এত থাকতেও জীবনটা যেন শ্মশান হয়ে গেছে, মরুভূমি হয়ে গেছে মনে হয়। কিন্তু সেই মরুভূমির মধ্যে দু-এক ফোঁটা শিশির তো আমরা ইচ্ছে করলেই ফেলতে পারি সুবিমল, শ্মশানেও দু-একটি ফুল ফোটাতে পারি। কী বলো, পারিনে?'

সুবিমল চুপ করে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে রইল। এই মুহূর্তে কিছু তার বলবার শক্তি ছিল না, কিছু লিখবারও নয়।

॥ যযাতি ॥

শনিবার বিকেলে কোর্ট থেকে সকাল সকালই ফিরে এলেন পঞ্চানন দত্ত। চাকর গোবিন্দ এসে দোর খুলে দিল। পঞ্চানন বললেন, 'তোর মা কইরে।'

'মা উনুনে আঁচ দিচ্ছেন বাবু।'

'কেবল উনুন আর উনুন, রান্নাঘর আর রান্নাঘর। সংসারে আর কিছু চিনল না। তুই কী করছিলি। হাত পা গুটিয়ে তুই কি ঠুঁটো জগন্নাথ হয়েছিস। সময়মত আঁচটাও দিতে পারিস নে?'

গোবিন্দ বলল, 'পারব না কেন বাবু। আমার কাজ যে মার পছন্দ হয় না।'

পঞ্চাননবাবু বললেন, 'হতভাগা, যা এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে আয় চট করে।'

গোবিন্দ বেরিয়ে গেল। পনের মিনিটের মধ্যে ও আর ফিরবে না। আর যদি বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তাহলে আধঘণ্টাও কাটিয়ে দিয়ে আসতে পারে।

ভিতরে ঢুকবার আগে ছোট চিঠির বাক্সটা একবার খুলে দেখলেন পঞ্চাননবাবু। ইলেকট্রিকের বিল, প্রিমিয়ামের নোটিশ, একখানা মাত্র চিঠি আছে পুত্রবধূ অর্চনা দত্তের নামে। পঞ্চাননবাবু একটু হাসলেন। নীলাভ রঙের খাম। ওজনে বেশ ভারি। না, বেয়ারিং হয় নি। ডাকটিকেট হিসেব করেই আঁটা আছে। বাবাজীর মূলে ভুল নেই।

চিঠিগুলি হাতে নিয়ে ভিতরে ঢুকে পঞ্চাননবাবু উদাত্তকণ্ঠে ডাক দিলেন, 'বাসন্তী, বাসন্তী।'

ছাইমাখা হাতে মাথায় আঁচল তুলে দিয়ে একটি প্রৌঢ়া স্থূলাঙ্গী মহিলা স্বামীর সামনে এসে দাঁড়ালেন। তারপর নিচুগলায় বললেন, 'ছি-ছি-ছি। তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?'

পঞ্চাননবাবু বললেন, 'কেন মাথা খারাপ হবার কী হলো।'

বাসন্তী লজ্জিত হয়ে একটু হেসে বললেন, 'অমন নাম ধরে চেঁচাচ্ছ যে?'

পঞ্চাননবাবু বললেন, 'তাতে কী হয়েছে। আমি তো আর বে-আইনী কিছু করি নি। নিজের স্ত্রীর নাম ধরেই ডেকেছি। এর মধ্যে পরস্ত্রীর নাম গন্ধও নেই।'

বাসন্তী বললেন, 'কী যে বল, কেউ যদি শুনতে পায়।'

পঞ্চাননবাবু বললেন, 'কে শুনবে বল। মেয়েরা শ্বশুরবাড়ি, ছেলের বউ বাপের বাড়ি, ছেলে দামোদর ভ্যালির বাঁধ বাঁধতে ব্যস্ত। চাকরটাকে সিগারেটের অছিলায় বাইরে পাঠিয়েছি। এখন চেঁচিয়ে ডাকা, আর কানে কানে ডাকা সমান। আমরা দুজন আর ঘরের চারদেয়াল ছাড়া কেউ নেই। আমরা কী বলছি না বলছি, কে শুনবে। আমরা কী করছি না করছি কে দেখবে।'

পঞ্চাননবাবু স্ত্রীর দিকে একটু এগিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বাসন্তী সভয়ে দু'পা পিছিয়ে গেলেন।

'ছি-ছি-ছি, তোমার যদি কোন কাণ্ডজ্ঞান থাকে। খোলা বারান্দা, সামনের ফ্লাট থেকে সব দেখা যায়।'

পঞ্চাননবাবু হেসে ঘরের ভিতরে ঢুকলেন। কেউ দেখলে লজ্জায় তাঁকে জিভ কাটতে হবে, কি চোখ বুজে আঁধারের কালো পর্দা টেনে দিতে হবে এমন কাণ্ড অবশ্যই তিনি করতেন না। শুধু স্ত্রীকে একটু ভয় দেখালেন। আদর না, আদরের ভয়, আদরের ভান। চিঠিগুলি টেবিলের ওপর রেখে কোর্টের ধরাচূড়া খুলতে লাগলেন পঞ্চাননবাবু।

এই ষাট বছর বয়সেও তিনি যতখানি সজীব আর সচল বাসন্তী তা নেই। বাসন্তী যেন অনেক আগেই বুড়িয়ে গেছে। কুড়িতে না

হলেও চল্লিশে তো বটেই। চল্লিশের পর থেকে বাসন্তী শুধু গৃহিণী আর সচিব। সখী নয়। ললিতকলায় শিষ্যত্ব গ্রহণেরও কোন আগ্রহ নেই। ওর একমাত্র শিল্প গৃহশিল্প। একমাত্র বিজ্ঞান গার্হস্থ্য বিজ্ঞান। তাতে অবশ্য দুঃখ নেই পঞ্চাননের। বাসন্তীর মত স্ত্রী হয় না। আজই না হয় তিনি সচ্ছল অবস্থায় এসেছেন। কিন্তু প্রথম যৌবনে, মধ্য যৌবনে অনেক দুঃখ দুর্দিনের সঙ্গে যখন যুঝতে হয়েছে বাসন্তী ছিল সেই দুঃসাধ্য সাধনের সঙ্গিনী। প্রতিবাদ করে নি, অভিযোগ করে নি, পরম ধৈর্য নিয়ে দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, ছেলে মেয়েদের মানুষ করে তুলেছে। স্ত্রীর ওপর খুবই কৃতজ্ঞ পঞ্চাননবাবু। আরও পাঁচজন বন্ধুর বিশেষ করে একালের ছেলেদের অশান্ত জটিল দাম্পত্য জীবনের কথা তাঁর অজানা নেই। কত বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা তিনি নিজের হাতেই করেছেন। অসুখী স্বামী স্ত্রীর পক্ষে বিচ্ছিন্ন হবার যুক্তিপাল বিস্তার করেছেন হাকিমের কাছে। কিন্তু নিজের দাম্পত্য জীবনের ধারায় কোনদিন ছেদ পড়েনি, বড় রকমের কোন ঝগড়াঝাঁটি পর্যন্ত হয় নি কোনদিন।

বাসন্তী এবার হাতটাত ধুয়ে সামনে এসে দাঁড়ালেন, 'কী ভাবছ?'

পঞ্চানন বললেন, 'তোমার কথা।'

বাসন্তী বললেন, 'আহাহা, যত মন রাখা কথা তোমার। আমার কথা ভাবতে যাবে কেন। আমি তো তোমার সামনেই আছি। নিশ্চয়ই মক্কেলদের কথা ভাবছিলে।'

পঞ্চাননবাবু বললেন, 'না গো না। মক্কেল আর এখন আমার মাথায় নেই। কাল কিসের তারিখ বল তো? মনে আছে না ভুলে গেছ?'

বাসন্তী হেসে বললেন, 'ভুলে যাব কেন, ঠিকই মনে আছে। বিয়ের তারিখ।'

পঞ্চাননবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, কাল বিয়ে। আজ অধিবাস। কালকের দিনটা কী ভাবে কাটানো যাবে বল তো।'

বাসন্তী বললেন, 'কী ভাবে আর কাটানো যাবে। জামাই মেয়েদের বলেছি ওরা আসবে। বালীগঞ্জ থেকে অর্চনাকেও আনিয়ে নেব। ওর বাবা-মাকেও বলেছি, বুঝলে? নতুন কুটুম্ব। মাঝে মাঝে বলতে হয়।'

পঞ্চাননবাবু একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'বেশ করেছ। মানে আবার একটি হাট মেলাবে।'

বাসন্তী বললেন, 'ও-মা ও আবার কী কথা। হাট মিললে তো ভালোই। তোমার চাঁদের হাট। ওরা কেউ না থাকলে ঘরগুলি যেন খাঁ-খাঁ করে তাই না?'

পঞ্চাননবাবু বললেন, 'হুঁ।'

স্ত্রীর ব্যবস্থায় তাঁর মন খুব প্রসন্ন হল না। তাঁর ইচ্ছা ছিল এই উপলক্ষে তরুণ তরুণীর মত শুধু দুজনে কোথাও বেরোবেন, লক্ষ্যহীন-ভাবে ঘুরে বেড়াবেন, অবশ্য পায়ে হেঁটে না, বাসে ট্রামেই, কি একটা ট্যাক্সিও ইচ্ছে করলে নিতে পারেন। তারপর হয় তো কোন মিষ্টির দোকানে গিয়ে খাবেন, পঞ্চাননবাবু মাংসের চেয়ে মিষ্টিই ভালো-বাসেন। তারপর যদি ইচ্ছে হয় কোন একটা থিয়েটার কি সিনেমা দেখে বাড়ি ফিরবেন। একদিনের জন্যে স্ত্রী হবে বান্ধবী, তাঁর তো আলাদা কোন বান্ধবী নেই, আজকালকার ছেলেদের যেমন থাকে।

একটি দিন নতুন স্বাদে ভরে উঠবে।

কিন্তু 'Man proposes, woman disposes' বাসন্তী এই দিনটিকে পুরোপুরি একটি সামাজিক দিন হিসেবেই বেছে নিয়েছে। নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ তো অন্য কোন উপলক্ষেও চলত, চলেও।

বাসন্তী বললেন, 'তাই বলে আমাদের বিয়ের তারিখের কথা যেন বেয়াই বেয়ানকে বোলো না। মেয়েরা জানলে জানুক। কিন্তু বাইরের আর কেউ যেন না জানতে পারেন। আমার ভারি লজ্জা করে।'

গোবিন্দ সিগারেট নিয়ে এসে চায়ের জল চড়িয়ে দিল। চা আর

খাবার খেয়ে পঞ্চাননবাবু বললেন, 'কাল তো আর বেরোন হবে না, চল আজই বেরোই। চল, তোমার জন্যে একখানা শাড়ি কিনে নিয়ে আসি।'

বাসন্তী হেসে বললেন, 'শাড়ি আমার আছে। তার জন্যে এখনই বাইরে বেরোবার দরকার নেই।'

পঞ্চানন বললেন, 'তাহলে কি চাই বল। আংটি না হার?'

বাসন্তী বললেন, 'ওগো, না গো না। তুমি আমাকে সব দিয়েছ। মেয়েদের ছাড়া যদি মার্কেটিং করি, ওরা আমাকে রক্ষে রাখবে না। যা করতে হয় কাল করা যাবে।' পঞ্চাননবাবু বললেন, 'বুঝতে পেরেছি। চল, এমনিই না হয় একটু ঘুরে আসি।'

বাসন্তী একটু যেন আতঙ্কের সুরে বললেন, 'এই শীতের মধ্যে বেরোবে? কদিন ধরে বাতটা বড় কষ্ট দিচ্ছে। শরীরটাও ভালো যাচ্ছে না। আচ্ছা চল।'

পঞ্চাননবাবু বললেন, 'তাহলে থাক।'

'থাকবে কেন, চল।'

'আমি এত অবিবেচক নই, তোমার কষ্ট হবে তবু তোমাকে টেনে নিয়ে যাব? তার চেয়ে এসো বসে বসে গল্প করি।' বাসন্তী খুশি হয়ে বললেন, 'সেই ভালো।'

তিনি স্বামীর পাশে এসে ঘেঁষে বসলেন।

পঞ্চানন বললেন, 'তুমি নাম ধরে ডাকাডাকির কথা বলছিলে, জানো আজকাল স্বামী তো সবাইর সামনে স্ত্রীকে নাম ধরে ডাকেই, স্ত্রীও ডাকে।'

বাসন্তী হেসে বললেন, 'তোমার মেয়েরাই তো ডাকে। অবশ্য আমাদের সামনে না, আড়ালে। তবু অতটা বাড়াবাড়ি আমার পছন্দ নয়। ভালোবেসে বিয়ে করলেই বা কি। নাম ছাড়া কি ডাকা যায় না?'

পঞ্চাননবাবু বললেন, 'কেন নাম ধরে ডাকাই তো ভালো। তুমিও ডাক না আমার নাম ধরে।'

বাসন্তী কিশোরীর মত লজ্জায় আরক্ত হয়ে বললেন, 'না বাপু। আমি তা পারব না। এ জন্মে আর হবে না, পরজন্মে এসে ডাকব।'

পঞ্চানন স্ত্রীকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, 'উহুঁ, এই জন্মেই ডাকতে হবে। আজ তুমি আমার কোন অনুরোধই রাখবে না, তা হতে পারে না। নাম ধরতে তো আর বাতে আটকায় না।'

বাসন্তী বললেন, 'ছাড়ো ছাড়ো গোবিন্দ এসে পড়বে। বলছি ডাকব, কথা দিচ্ছি ডাকব। কিন্তু আমারও একটি সর্ত আছে।'

'কী সর্ত ?'

'তুমিও আগের মত সুন্দর করে আমাকে একখানা চিঠি লিখবে। সেই তখনকার মত, সেদিনকার ভাষায়। জানো, লক্ষ্মীছাড়া চোর সেবার আমার সবগুলি চিঠি শুদ্ধু ট্রাঙ্কটা চুরি করে নিয়ে গেল। একটা চিঠিও আমার নেই। দেবে আমাকে একটা চিঠি ? আজই লিখে দাও।'

পঞ্চাননবাবু বললেন, 'দেব।'

বাসন্তী বললেন, 'এখনকার বুড়ো বুড়ীর চিঠি না। কোন সংসারী কথা তাতে থাকবে না। শুধু—। বুঝেছ ?'

পঞ্চাননবাবু হেসে বললেন, 'বুঝেছি। তুমি জবাব দেবে ?'

'নিশ্চয়ই দেব।'

'তাহলে বায়নাটা আগে দিয়ে যাও। যাতে লিখতে বসতে পারি।'

বাসন্তী স্বামীর কানের কাছে মুখ নিয়ে অস্ফুটস্বরে নামটা উচ্চারণ করে হেসে ফেললেন, তারপর লজ্জায় পালিয়ে গেলেন ঘর থেকে। কোথায় বাত, কোথায় স্থূলত্ব। সেই ষোড়শী তন্বী যেন ফিরে এসেছেন।

এবার পঞ্চাননের পালা। দোর ভেজিয়ে দিয়ে তিনি চিঠি লিখতে বসলেন।

কিন্তু মহামুস্কিল। কিছুতেই পছন্দমত সম্বোধনটা আসে না। আর ভাষাতো নেই। একটু নরম করে লিখতে গেলে নিজেরই হাসি পায়। প্রবীণ আক্কেল বুদ্ধি যেন হাত বাড়িয়ে তাকে চড় মারে।

অনেকদিন ব্যক্তিগত কোন চিঠিপত্র লেখেন নি পঞ্চানন। যা লিখেছেন সব ইংরেজীতে, যা লিখেছেন উকিলের চিঠি। ছেলে-মেয়েদের কাছে তাঁর হয়ে তাঁর জবানীতে তাদের মা-ই চিঠি লিখেছে। স্ত্রীর কাছে চিঠি লেখার উপলক্ষ হয়নি আজ বিশ বছর।

মহা বিপদেই পড়লেন পঞ্চানন। পুরো একটা প্যাড ছিঁড়ে ছিঁড়ে স্তূপাকার করলেন। তাঁর ব্যর্থ চেষ্টা ঘর ভরে ছড়াতে লাগল। তিনি কি শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর কাছে তারুণ্যের প্রতিযোগিতায় হেরে যাবেন? তা-তো কিছুতেই হতে পারে না।

অসহায়ভাবে উপায় খুঁজতে লাগলেন পঞ্চানন। ঘরভরা সব আইনের বই দর্শনের বই। ধারেকাছে কোন নাটক নভেল চোখে পড়ল না।

হঠাৎ টেবিলের ওপর চোখ পড়ল পঞ্চাননের। দুটি চোখ অপলক হয়ে রইলো।

একটু ইতস্তত করলেন। তারপর উঠে গিয়ে খিল দিলেন দরজায়, দেরাজ টেনে বের করলেন পেনসিলকাটা ছুরিখানা। তারপর কম্পিত হাতে নীলাভ রঙের পুরু খামটি নিজের দিকে টেনে নিলেন।

॥ ক্যামেরা ॥

সকাল থেকেই গোলমালটা স্থুরু হয়ে গেল। সন্ধ্যা বেলায় রেডিওতে প্রোগ্রাম আছে স্থুরমার। ছটো সিটিং। রাগপ্রধান আর ভজন। হাত মুখ ধুয়ে চা টা খেয়ে তানপুরাটা নিয়ে একটু রেওয়াজ করতে বসবে স্থুরমা এই সময় গোলমালটা বাঁধল।

ভাড়াটে বাড়ী। ছখানা মাত্র ঘরে পরিবারের সাতটি মানুষের আশ্রয়, স্থুরমা, তার বাবা মা, আরো চারটি ভাইবোন। ছটি কলেজে ঢুকেছে, ছটি স্কুলে পড়ে। বড় ঘরখানায় স্থুরমার বাবা থাকেন তক্তপোষের ওপরে, নীচে বিছানা পেতে ছটি ছোট ছেলে কানাই বলাইকে নিয়ে মা থাকেন। আর তিন বোন স্থুরমা, স্থুষমা, স্থুলতা থাকে ছোট ঘরটিতে। সেই ঘরে বসেই ওরা কলেজের পড়া পড়ে। বড় ঘর বাবা আর ছুই ভাইয়ের দখলে। স্থুরমার শোয়ার নির্দিষ্ট জায়গা আছে, কিন্তু গানের নির্দিষ্ট স্থান নেই। কখনো এঘরে কখনো ওঘরে তানপুরা আর বাঁয়া তবলা নিয়ে টানাটানি করে বেড়ায় স্থুরমা। এই ভাবে কি আর গান হয়? অথচ গান শুধু আজ তার নিজেরই সখের সামগ্রী নয় সংসারের বার আনা খরচ এই গান গেয়েই উপার্জ্জন করে আনতে হয় স্থুরমাকে। রেডিওতে মাসে একবার করে প্রোগ্রাম পায়, তিনটি স্কুলে গান শেখায়। সপ্তাহে ছদিন করে ক্লাস বসে চালিয়ে নিতে পারে। তাছাড়া টুইশনতো আছেই। গান শুধু স্থুরমারই সখ নয় গান আজ গোটা সংসারের প্রাণ। তবু এই গানের জন্মে আলাদা একখানা ঘর পাওয়ার জো নেই স্থুরমার। একটু নিশ্চিন্তে বসে নির্বিঘ্নে যে রেওয়াজ করবে তার উপায় নেই অথচ এই সংসারের জন্মই সে সব দিয়েছে।

প্রথমে নিজের ঘরে বসেই রেওয়াজ করতে চেয়েছিল সুরমা। কিন্তু সুষমা আর সুলতা হাত জোড় করল, ‘দিদি দয়া করে আজকের দিনটা আমাদের রেহাই দে। কাল থেকে প্রিটেষ্ট আরম্ভ প্রিপ্যারে-শন কিচ্ছু হয়নি।’

সুরমা গম্ভীর মুখে তানপুরাটা নিয়ে বড় ঘরে গিয়ে দেখে বাবা কানাই বলাইকে অঙ্ক কষাতে ব্যস্ত। তিনি বললেন, ‘জানিস সুরি অঙ্কে ওরা এত কাঁচা রয়ে গেছে যে পাশ করাই ওদের পক্ষে ধূম। খাওয়া পরা সবই চলছে কিন্তু পড়াশুনোটাই নেগলেকটেড হচ্ছে সব চেয়ে বেশি। অথচ এইটাই আসল।’

সুরমা একথার জবাব না দিয়ে বলল, ‘আমি এঘরে বসে একটু রেওয়াজ করব।’

সুরমার বাবা বললেন, ‘তুই বরং ও ঘরেই যা সুরি। এখানে সারে গামা আরম্ভ হলে ওদের আর অঙ্কটঙ্ক কিচ্ছু হবে না। নামেই ক্লাস সেভেন আর ক্লাস এইট। কিন্তু বিদ্যা বুদ্ধি ফোর ফাইভের ষ্ট্যাণ্ডার্ডেও ওরা পৌঁছায়নি।’

মোটে এইটুকু কথা। সুরমা চেঁচিয়ে উঠে বলল, ‘বেশ তাহলে এঘরে অঙ্ক আর ওঘরে হিষ্ট্রী লজিকই চলুক। আমার গানটানের আর দরকার নেই, প্রোগ্রামও আমি আজ আর করব না।’

তানপুরাটা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রেখে সুরমা বেরিয়ে এল। তবলচী বিশু মুখুজ্যেকে বলে দিল আজ আর সে রেওয়াজে বসবে না। বিশু একটু বিস্মিত হয়ে বলল, ‘সে কি সুরমাদি, আজ আপনার প্রোগ্রাম না।’

সুরমা বলে দিল, ‘আজ আমার শরীর ভালো না। আজ প্রোগ্রাম করব না। রিহার্শেলেরও দরকার নেই। আজ তুমি যাও।’

বিশু তবু ইতস্ততঃ করছিল। কিন্তু সুরমা তাকে প্রায় ধমকেই বিদায় দিল।

সুরমার মা রান্নাঘরের সামনে বসে তরকারী কুটছিলেন, বঁঠিখানা কাত করে রেখে উঠে এসে বললেন, 'সুরি, একি আচরণ তোর।' সুরমা বলল, 'আচরণের আবার কি দেখলে?'

মা বললেন, 'চোখ থাকলেই দেখতে হয়। ভগবান যদি চোখ ছুটো নিতেন তাহলে বাঁচতাম, এসব আর দেখতে হত না।'

সুরমা বলল, 'চুপ কর মা অত চেঁচিয়ো না। একটা কথা বলেছি তো চেঁচিয়ে একেবারে বাড়ী মাথায় করে তুলেছেন।' মা বললেন, 'ওই রকমই তোলে বাছা। গা জ্বালা করলেই, চেঁচানি আসে। তোর আজ প্রোগ্রাম, তুই তবলচীকে চলে যেতে বললি কেন?'

সুরমা বলল, 'বলব না কি করব। গান বাজনায় সবাইর পড়ার ব্যাঘাত হয়, বাবা অসুবিধে বোধ করেন। আমি তো আর রাস্তায় বসে রেওয়াজ করতে পারিনে। একখানা ঘরে খানিকটা জায়গাতো আমার চাই, তাও যখন আমার জুটছে না, আমি সব ছেড়ে ছুড়ে দেব।'

সুষমা আর সুলতা বইপত্র ফেলে সামনে এসে দাঁড়াল। বছর দেড়েকের ছোট বড়। সুষমা উনিশ পেরিয়েছে সুলতার এখনো আঠারো চলেছে ছু'জনেই আই, এ, পরীক্ষা দেবে। সুষমা বলল, 'দিদি তুই একি বলছিস। তুই মুখ ফুটে বলতিস আমরা বই নিয়ে অন্য ঘরে চলে যেতাম। না হয় একঘণ্টা পড়া বন্ধই রাখতাম। তাই বলে তুই রেওয়াজ করবিনে একি কথা? তোর গানের ব্যাঘাত করে আমরা কবে কি করেছি।'

সুরমা মুখ বাঁকিয়ে বলল, 'থাক থাক আর দরদ দেখাতে হবে না তোদের। আমার গানের জন্য যে তোদের কত চিন্তা তা আমার আর বুঝতে বাকি নেই।'

সুলতা বয়সে সব চেয়ে ছোট হলে কি হবে কথার ঝাঁঝ ওরই সবচেয়ে বেশি। সে এবার আড়াল ছেড়ে এগিয়ে এসে বলল, 'দিদি

অকৃতজ্ঞতার একটা সীমা আছে। তোর গানের জন্যে আমরা কি না করি। তোর গান-বাজনা উপলক্ষ্য করে এই ঘরখানার মধ্যে কত লোক আসে। অনেক সময় কত বাজে লোকও আসে। আমরা কি বুঝিতে পারিনে? বুঝে আমরা কি সহ্য করে যাইনে? তুই সংসারের খরচ চালাচ্ছিস আমরা তাই চুপ করে থাকি। সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকি, পাছে তোর কোন অস্থবিধে হয়। কিন্তু তুই পান থেকে চূণ খসলেই একেবারে মাথা কেটে নিতে চাস। একি স্বভাব রে বাবা?'

কিন্তু স্থরমা তার আগেই চেঁচাতে শুরু করেছে, 'শোন মা তোমার ছোট মেয়ের কথা শোন। তোমার গুণবতী মেয়ের কথা শোন এক-বার। আস্পর্দ্ধা দেখ একবার। আমার কাছে নাকি বাজে লোক আসে। একথা আমাকে কেউ বলতে সাহস পায়নি আর তোমার গুণ-ধরী মেয়ে তা বলে সারল। বল্ স্থলী, কোন্ বাজে লোকটাকে তুই দেখেছিস। নাম বল, নইলে আমি ছাড়ব না। মিথ্যে অপবাদ দেওয়ার পরিণাম তোকে ভোগ করতেই হবে। আমি তোর এক একটি করে দাঁত ভেঙে দেব।'

স্থলতা বলল, 'তুমি রোজগার করে খাওয়াচ্ছ। এক একটি করে কেন ইচ্ছা করলে সবগুলি দাঁতই এক গুতোয় ভেঙে ফেলতে পার। তোমার হাতে অসীম ক্ষমতা। এতো আর ডেন্টিষ্টের হাত নয়, আর্টিষ্টের হাত। কোমল হাত, কোমল মন, কোমল গলা। কোমলতার কি নমুনাই না দেখাচ্ছ।'

এই শ্লেষ টিটকারির পর স্থরমা আরো আগুন হয়ে গেল। দাঁতে দাঁত পিষে বলল, 'অকৃতজ্ঞ বেইমান! ঝাঁড় শুদ্ধ বেইমান।'

স্থরমার মার আর সহ্য হল না। তিনি স্বামীর কাছে গিয়ে হাত মুখ নেড়ে বলতে লাগলেন, 'শুনলে? মেয়ের কথা শুনলে! স্থরি তোমাকে আমাকেও ছেড়ে কথা বলছে না। কেন বলবে? ও যে খাওয়াচ্ছে পরাচ্ছে। তোমার ছুটি পায়ে পড়ি তুমি মেয়ের রোজগার

আর নিয়ো না। তোমার একটা চাকরিতে না কুলোয়, দুটো চাকরি কর। তিনটে চাকরি কর। দিন রাত খাট। তাতেও যদি সংসারের পেট না ভরে সবাই আধ পেটা খেয়ে থাকুক। তবু যেন কুমারী মেয়ের রোজগার কাউকে খেতে না হয়। দিনরাত খোঁটা আর ঠেস মারা মারা কথা আমার আর সহ্য হয় না।'

সুরমা প্রতিবাদ করে বলল, 'এসব আবার তুমি পেলে কোথায়? এসব কথা এল কোত্থেকে! কে তোমাকে খাওয়া পরার খোঁটা দেয় শুনি? আহ্লাদ দিয়ে দিয়ে তুমি ছোট ছেলেমেয়েগুলির মাথা খাচ্ছ আর তা বলতে গেলেই দোষ?'

সর্বেশ্বরেরও পৌরুষে বাধল। তিনি বললেন, 'বেশ তো ওর যদি সংসারে টাকা দিতে কষ্ট হয় ও তা বলে দিলেই পারে। আমাদের এক গতি হবেই।'

এই নিয়ে ঝাড়া এক ঘণ্টা ধরে ঝগড়া চলল। সুরমা একদিকে আর সবাই একদিকে। সুরমা বলল, সবাই অকৃতজ্ঞ। তার দিকে কেউ চায় না তার কষ্টের কথা কেউ ভাবে না। সে যে দিনরাত খাটে কাদের জন্য? সে যে অর্থের জন্যে যশকে বলি দিতে যাচ্ছে, কোয়ালিটি নষ্ট করছে কাদের জন্যে?

সুলতা বলল, সুরমা যেমন খাওয়ায় পরায় সংসারে টাকা এনে দেয় তেমনি আদর যত্নও যথেষ্ট করা হয়। দুধটুকু ঘিটুকু সব সময় তার পাতেই পড়ে। কিসে তার গলা ভালো থাকবে তাই নিয়ে সবাই মাথা ঘামায়। কৃতজ্ঞতার আর কি চায় সুরমা? সে কি চায় সবাই কাজ কর্ম পড়াশুনো ফেলে তার পায়ের তলায় পড়ে থাকুক।

ঝগড়া চলতে লাগল।

হঠাৎ সদর দরজার কড়া নড়ে উঠল। চুপ চুপ। বাইরে থেকে কে যেন এসেছে। কানাই গিয়ে দরজা খুলে দিল। অঙ্কের হাত থেকে বলাই অনেক আগেই রক্ষা পেয়েছিল। এবার জানলা দিয়ে একটু উঁকি মেরে দেখেই উৎসাহে উল্লাসে চীৎকার করে উঠল,

'বড়দিদি, বড়দিদি, ক্যামেরাম্যান এসেছে, ক্যামেরাম্যান ফটো তুলতে এসেছে।'

খোলা দরজা দিয়ে পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের এক সুদর্শন যুবক ঘরে ঢুকল। হাফসার্ট আর ট্রাউজারে তাকে খুবই স্মার্ট বলে মনে হচ্ছে। তার কাঁধে ক্যামেরা বগলে কাগজে জড়ানো কি একটা বস্তু। হাতে ঝুলানো আরো একটা রঙিন থলি।

মুখখানা ধুয়ে আঁচল দিয়ে মুছে আটপৌরে শাড়িতেই সুরমা এসে সামনে দাঁড়াল। মুখে একটু হাসি টেনে বলল, 'কি ব্যাপার।'

ফটোগ্রাফার বলল, 'আজ্ঞে আমরা 'মনোরথ' পত্রিকা থেকে এসেছি। আপনার একখানা ফটো তুলে নেব। এর আগে আপনার সঙ্গে আলাপ করে গেছেন আমাদের সুজিত সেন। তিনি আপনার জীবনচিত্র কলমে তুলে নিয়ে গেছেন। চমৎকার হয়েছে। বাকি কাজটুকুর ভার আমার ওপর।'

ফটোগ্রাফার বিনীত সৌজন্যে হাসল।

সুরমা একটু ইতস্ততঃ করে বলল, 'কিন্তু আজ তো আমার ফটো ভালো হবে না।'

ফটোগ্রাফার আত্মবিশ্বাসে অটল। সে হেসে বলল, 'খুব ভালো হবে। আজকের ওয়েদারটি চমৎকার। আর যদি কিছু মনে না করেন তাহলে বলি, যে কোন ওয়েদারে যেখান থেকেই তুলি না কেন আপনার প্রোফাইল চমৎকার হবেই।'

সুরমা একটু লজ্জিত হয়ে বলল, 'কিন্তু আজকের দিনটা বাদ দিলেই যেন ভালো ছিল। আজকে ঠিক আমার মুড নেই।'

ফটোগ্রাফার হেসে বলল, 'মুডের জন্যে ভাববেন না। মুড আমি ঠিক এনে দেব। তাই যদি না পারব তাহলে বৃথাই ক্যামেরা কাঁধে নিয়ে ঘুরছি। তাছাড়া ফটোটা আজই আমাদের নিয়ে যাওয়া দরকার। নইলে এ সংখ্যায় আর দেওয়া যাবে না।'

কানাই বলাই পিছন থেকে প্রম্পট্ করছে, 'বড়দি বলে দাও

আজই তুলব। বড়দি, আজই তোলার কথা বলে দাও।'

শেষ পর্যন্ত রাজী হল সুরমা। বড় ঘরে গিয়ে শাড়িটা বদলে এল।

সুলতা ট্রাঙ্ক থেকে তার কলাপাতা রঙের শাড়িখানা বের করে বলল, 'দিদি, এইটে পর, এইটে তোকে বেশ মানাবে।'

সুরমা একবার তার দিকে তাকাল। কিন্তু শাড়িখানা নিতে কোন আপত্তি করল না।

সর্বেশ্বর বললেন, 'তানপুরাটা হাতে নিয়ে তোল। ফটোগ্রাফার পরামর্শটা অগ্রাহ্য করল না। হেসে বলল, 'বেশতো তানপুরাটা নিয়েই তুলুন। সেই ভালো হবে। বসে তুলতে হবে তাহলে।'

মা এসে ছোট কাঁচের আলমারিটা খুলে ফেললেন। একটা তাকে পাওয়া মেডেলগুলি সাজানো রয়েছে। আধখানা ঘোমটার আড়াল থেকে মা মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'ইণ্টালির জলসায় গতবার যে সোনার মেডেলটা পেয়েছিস সেইটা দেব বের করে?'

সুরমা লজ্জিত হয়ে বলল, 'না না মেডেল দিয়ে কি করব। মেডেল কি গলায় ঝুলিয়ে তুলব নাকি? তুমি কিচ্ছু জানোনা মা।'

ফটোগ্রাফার কাঁচের আলমারিতে মেডেলের বাক্সগুলির দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। তারপর সুরমার দিকে চেয়ে স্মিত মুখে বলল, 'খবরটা আমরা বেশ ভালো করে ছেপেছিলাম। চমৎকার হয়েছিল প্রোগ্রাম আপনার।'

এরপর ফটো তোলার পালা। তাকের ওপর ফটো টোটো কতকগুলি আছে। সেগুলি ঢাকবার জন্যে কাগজের মোড়ক খুলে স্ক্রীনটা বার করে টানিয়ে নিয়ে সেগুলি ঢেকে দিল ফটোগ্রাফার। ঘরে যে বিদ্যুৎ বাতি আছে তা যথেষ্ট জোরালো নয়। কিন্তু তার জন্যে কিছু চিন্তা নেই। ফটোগ্রাফার নিজের আলো নিজেই নিয়ে এসেছে, থলির ভিতর থেকে সেগুলি বেরোল। কানাই বলাইকে ডেকে বলল, 'এসো ভাই ধরতো দেখি একটু।'

ফটোগ্রাফারের সহযোগী হতে পেরে দু' ভাই কৃতার্থ।

দু দু বার ফটো নেওয়া হল সুরমার। দুটো ভিন্ন পোজের।

জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে ফটোগ্রাফার বিদায় নিতে যাবে। সুরমা হঠাৎ বলল, 'কিছু যদি মনে না করেন একট অনুরোধ করব।'

'বলুন না।'

'ইয়ে আপনার নামটা যেন কি।'

ফটোগ্রাফার হেসে বলল, 'আমাদের আবার নাম! আমার নাম শ্যামল দত্ত। সংক্ষেপে লিখি শ্রীশ্যাম।'

সুরমা বলল, 'আপনার পুরো নামটাই আমাদের কাছে ভালো লাগে। শ্যামলবাবু আমাদের একটা গ্রুপ ফটো তুলে দেবেন, খরচটা আমি দেব।'

শ্যামল জিভ কেটে বলল, 'ছি ছি ছি একি কথা বলছেন। আপনারা তৈরী হয়ে নিন। এক্ষুণি তুলে দিচ্ছি।'

সুষমা সুলতা মৃদু আপত্তি করেছিল কিন্তু সুরমা তাদের সে আপত্তি গ্রাহ্যই করল না সস্নেহে শাসনের সুরে বলল, 'যা বলছি তাই কর। তৈরী হয়ে নাও তাড়াতাড়ি।'

শুধু দুই বোনকেই না বাপ মাকেও গ্রুপভুক্ত হতে বাধ্য করল সুরমা। কানাই বলাইকে কিছু বলতে হল না, ওরা আগে থেকেই এক পায়ে খাড়া হয়ে আছে। জামা জুতো পরে তৈরী হয়ে নিতে ওদের দু মিনিটের বেশী লাগল না। সবাই এসে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াল।

ফটোগ্রাফারের বলে দিতে হল না। ছেলে মেয়েরা থেকে শুরু করে সর্বেশ্বর ও তাঁর স্ত্রী মনোরমা পর্যন্ত সবাই গোলাপের মত মুখে হাসি ফুটিয়ে রাখলেন। খানিক আগে যে ঝগড়া ঝাঁটি হয়ে গেছে পাছে তার কোনরকম ছাপ মুখে পড়ে। তাহলে ছবি বড় বিশ্রী দেখাবে।

॥ শেষ ॥